বিষের বাতাস।

(উপন্যাস)

শ্রীবিধুভুষণ বসু প্রণীত।

প্রকাশক—
শ্রীগোবিন্দ সাহিত্য মন্দির
২৩।১, হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।
১৩৩৫।

মূল্য পাঁচসিকা।

প্রকাশক—শ্রীশরৎকুমার হোড়,
শ্রীগোবিন্দ সাহিত্য মন্দির।
২৩।১, হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ

২৭শে আশ্বিন ১৩৩৫।

প্রিণ্টার—শ্রীশরৎকুমার হোড়
শ্রীগোবিন্দ প্রেস,
২৩।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

আমার
পরম স্নেহ ভাজন সুহৃদ
কুমার ব্রতধারী নিষ্কাম কর্ম্মী,
যিনি
আমাকে আমার বড় দুরবস্থা
ও
মহাশোকের সময়ে
সাধিয়া ডাকিয়া সেবা যত্ন সান্ত্বনা
ও
ভরসা দিয়া আমায় এই বৃদ্ধ বয়সে
আবার কর্ম্মের পথে তুলিয়া দিলেন,
সেই
চির স্বদেশ-মঙ্গল-কামী
মাতাপিতার ভক্ত সন্তান
শ্রীমান্ শরৎকুমার হোড়কে
এই গ্রন্থ
স্নেহোপহার প্রদত্ত হইল।

উপহার।



শ্রী [illegible]

কে

প্রদত্ত হইল।

তাং

শ্রী

মুখবন্ধ।

সংসারের অর্দ্ধেক বিপদ অতৃপ্তবাসনা নারী হইতেই সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু সংসারের জননীমূর্ত্তি নারীকে বিপদের জননী করিয়া দেয়, অনেক স্থলেই অসংযত বিলাসী পুরুষ। নারীকে দুর্ব্বল ভাবিয়া পুরুষ তাহাদিগকে লইয়া ভোগের খেলা খেলিতে যায়, নারীও চেষ্টা করে পুরুষবশে পরাধীনা থাকিয়া ভাল মানুষ বা সতী হইয়া জীবন যাপন করিতে। কিন্তু অতৃপ্ত বাসনার তাড়নায় যখন নারী আর সংযম মানিতে পারে না, তখন সে তাহার বহু যত্নের কৃত্রিম আবরণ ফেলিয়া গর্জ্জিয়া উঠে, তখন অতি বড় নৃশংস রাক্ষসীও তাহার ভয়ে মুখ ঢাকে। এই সত্য, সত্য যুগ হইতে এই কাল পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান। সংসারের এই ধ্বংস-প্রবাহ চারি যুগেই অক্ষুণ্ণ আছে। আমরা তাহারই একটী প্রবাহ "বিষের বাতাসে" বহাইয়া দিলাম।

২রা আশ্বিন ১৩৩৫।
বিষ্ণুপুর, খুলনা।

গ্রন্থকার

বিয়ের বাতাস।



(১)

"মেয়ের বিয়ের কিছু কর্ত্তে পাল্লেন হরিবাবু?" হরিনাথের খোড়ো ঘরের দাওয়ায় উঠিতেই নন্দকিশোর বাবু প্রশ্নটা করিলেন। হরিনাথ রুগ্ন দেহে হাফাইতে হাফাইতে, তাড়াতাড়ি একটা পুরান মাদুর দাওয়ায় ফেলিয়া আগে নন্দবাবুর অভ্যর্থনাব আয়োজন করিলেন। "বসুন! কখন এলেন? এ পর্য্যন্ত কি মনে করে? দয়ার শরীর, তাই গরীবকে মাঝে মাঝে মনে পড়ে।"

নন্দকিশোর জুতা খুলিয়া আসন লইলেন। কোটের বোতাম দুটো খুলিয়া দিলেন, তার পর বলিলেন, "কাজ কর্ম্মে আজকার দিনটা একটু ফুরসুত পেলুম, ভাবলুম জেনে আসি হরিবাবুর কন্যা-দায়টা কাট্‌লো কি না? উঃ! কি গরম! তবু পাড়াগাঁয়ে আপনারা ভাল আছেন।"

হরিনাথ তার ভাঙ্গা গলায় যত দূর সম্ভব স্বর করিয়া বলিলেন, "ওরে মানদা, শিগ্‌গীর পাখা নিয়ে বাতাস কর।"

বার তের বছরের একটী সুন্দরী মেয়ে একখানি সুন্দর কার্পেটের

পাখা আনিয়া বাবুর সম্মুখে রাখিয়া লজ্জায় জড়সড় হইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। বাবা মেয়েকে ধমক দিয়া বলিলেন, "দাঁড়িয়ে রইলি যে, বাতাস কর্‌না! ওঁকে আবার লজ্জা! আমি আর উনি কি ভিন্ন!"

নন্দবাবু এতক্ষণে পাখাখানি হাতে লইয়া ইহার কারু কর্ম্ম দেখিতে-ছিলেন। পাখায় একটী চিত্র বড় নিপুণ ভাবে সূতা দিয়া তোলা রহিয়াছে। জলের মধ্যে একটী পদ্ম, তার উপর দুটী ভ্রমর উড়িয়া পড়িতেছে, আর একটী তরুণী সাঁতার কাটিয়া সেই পদ্মটী তুলিতে যাইতেছেন। সাঁতার কাটিতে গিয়া জলের আঘাতে তার অঙ্গের বসন সরিযা যাইতেছে, তরুণীর এক হাতে সে গুলি গুছিয়ে নিতে বড় কষ্ট হইতেছে। নন্দ বাবু বলিলেন, "বেশ ত পাখাখানি! বড় সুন্দর ছবিটী তোলা হয়েছে? এ ছবিটী কোথায় পেলে? এ পাখা খানি তুমি করেছ বোধ হয়।"

বালিকা কথা বলিল না। হরিবাবুই বলিলেন, "ওইত করেছে, ও সব কাজে ও সরস্বতী! কর,—হাওয়া কর মা, বাবুকে।"

বালিকা সলজ্জে পাখা ধরিল। নন্দবাবু বলিতে লাগিলেন, "আঃ কি সুন্দর ছবিখানি! এ ছবিটা তুমি আপনি মনে ভেবে এঁকেছ? বাঃ! বড় সুন্দর কল্পনা ত তোমার!"

মানদা ছোট করিয়া লজ্জায় চোখ বোজ বোজ করিয়া বলিল, "একখানা বইতে এমনি একটা ছবি আছে, আমি ঠিক তেমনি পারি নাই।"

"পার নাই কি! তার চেয়ে ভাল পেরেছ। দেখি পাখাখানা, থাক্, আর হাওয়া কর্ত্তে হবে না।" বলে নন্দবাবু মানদার হাত থেকে পাখাখানা নিজ হাতে নিলেন। হরি বাবু বলিলেন, "তবে যা, বাড়ীর ভিতর বলে আয় নন্দবাবু এখানে খাবেন, গরীবের বাড়ী যা দুটী ডাল-ভাত হয়, সকাল সকাল যেন হয়।"

নন্দবাবু বলিলেন, "না না, আমি এই সাড়ে ন'টার ট্রেনে একবার বাড়ীতে গিয়ে, ও বেলায় ৫টার লোক্যালে আবার কল্‌কাতায় ফিরব ভাবছি।"

"না, না, তাকি আর হয়, সাড়ে বারটার ট্রেনে যাবেন।" বলিয়া হরিনাথ নিজেও বাড়ীর ভিতর গেলেন। মানদা তার আগেই চলিয়া গিয়াছে। একটু পরে হরিনাথ ফিরিয়া আসিয়া, খানিকটা হাপিয়ে লই-লেন। হরিনাথের বয়স হইয়াছে পঞ্চাশের কাছাকাছি, তাতেও কিছু আসিয়া যাইত না,—আজ পাঁচ বছর তাঁকে হাপানির ব্যারামে ধরেছে, এখন দেহটা নেহাৎ অচল। সংসারে একটী ছেলে, একটী মেয়ে, আর গৃহিণী, তাও অচল। হরিনাথ রোগে পড়িয়া চাকরীতে জবাব পাইয়া অভাব কষ্ট পাইতেছেন। নন্দকিশোরের সঙ্গে তাঁর চাকরী-স্থলে পরিচয়। নন্দবাবু ক্ষমতার বলে—কেউ বলে ভাগ্যফলে, চাকরীতে বিশেষ উন্নতিই করিয়াছিলেন। এখন তাঁর কল্‌কাতায় একখানি বাড়ী, আর দেশে জমি গাঁতি বিস্তর হইয়াছে! নিজে একটা ব্যবসায়ে বখরা নিয়া বেশই দুপয়সা লাভ পাইতেছেন! তাঁর সকল দিকেই মাথা খেলে, সকল রকমেই অর্থ ফলে!

হরিনাথ একটু দম নিয়া বলিলেন, "তার পর যে কথা জিজ্ঞেস কল্লেন!—আমিত আপনার মুখ পানেই চেয়েই আছি! আপনি দয়া না কর্‌লে আমার আর উপায় নাই,—দেখলেন ত মেয়ে, ঠাকুরে খুঁৎ আছে, তবু আমার মেয়েতে কি খুঁৎ আছে?"

নন্দকিশোর বাবু মুখটা একটু বিকৃত করিয়াই বলিলেন, "তাইত, তোমায় ভরসা দিয়েই ত আমি ব্যাকুব হ'তে বসেছি! ছোড়াটা কিছু-তেই কথা মান্‌তে চায় না।"

"বলেন কি? আপনার ভাইপো শুন্‌বে না আপনার কথা?"

"ওত ভাই পো! এখন ছেলেই বা শোনে কই? ছোড়া বলে যে, আমার বিয়ের এখনও সময় হয় নাই, যত দিন একটা কিছু উপার্জ্জনের পথ না কর্ত্তে পারি, ততদিন বিয়ে আমি কর্‌বই না।"

"আপনিত ওকে খেতে পরতে দিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন। আপনার কথা শুন্‌বে না?"

"তা আর শোনে কই? আর কথাটা যা বলে তা বড় মিথ্যাও ত নয়! আজ কাল বিয়ে থা করা বড়ই ভাবনার বিষয়! এইত, পরিবার মরেছে আজ আট বছর হবে, মালক্ষ্মীর কৃপায়, ভাতের ভাবনাটা বড় ভাবতে হয় না, বিয়ের বয়স যে গেছে, তাও নয়, তবুত বিয়ে কর্ত্তে ইচ্ছা হলো না! দেখা যা'ক কি করা যায়। তোমার একটী উপায় ত কর্ত্তেই হ'বে। দেখ, অন্য কোথাও সম্বন্ধ, দশ পাঁচ টাকা যেমন পারি সাহায্য কর্‌বো! তোমার যে আবার খোট্, দ্বিতীয় পক্ষে দেবে না।"

তখন হরিনাথের ছেলে দুলাল চাঁদ—ময়লা ধুতিখানায় কোমরটা খুব শক্ত করে বাঁধা, হাটু পর্য্যন্ত ধূলা, সকল গায়ে পাঁচড়ার দাগ, মাথায় পাঁচ শিকা পাঁচ আনা গোছের চুল গুলি কিন্তু বেশ কেয়ারি করা সাজান, তেড়িটী একটুও বেমানান হয় নাই, বাবু একখানা ছড়ি ঘুরাতে ঘুরাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিনাথ বলিলেন, "আয়রে, প্রণাম কর তোর কাকাকে!" দুলাল চাঁদ প্রণাম করিল। তারপর হরিনাথ বলিলেন, "যা দেখ্‌ত বাবা, দুটো মাছ ধরতে যদি পারিস! বাবু কত বড় মানুষ, কি দিয়ে সুমুখে দুটী ভাত দেই?"

দুলাল মুখ বাঁকা করিয়া বলিল, "তা আর এখন হয় না, আমি সাত সাত মোতে ঘুমাই নি!" দুলালের বয়স হইয়াছে ষোল, কিন্তু তিনি

র আর ট উচ্চারণ করিতে এখনও শিখেন নাই। বাপ একটু তর্জ্জন করিয়াই বলিলেন, “ভারি কাজেই গিয়েছিলে।”

নন্দ বাবু বলিলেন, “কোথায় গিয়েছিলে দুলাল !”

“গিয়াছিলাম এক খানে।” বলিয়া দুলাল একবারে অন্দরে চলিয়া গেল। আসল কথা, দুলাল সখের থিয়াটারের পার্টির একজন নায়ক, এত বড় একটা সাজগোজ পরা মস্ত বাবুর কাছে সেটা বলা যে একটু লজ্জহীনতার ব্যাপার, তা বুঝিবার মত বুদ্ধি দুলালের আছে।

ওদিকে ভিতর হইতে বিশেষ তীব্র তিক্ত নারী কণ্ঠে কলহ ধ্বনি উঠিল, “আচ্ছা থাক্, দেখবো। পরের দোরে কখনও আসতে হয় কি না! এক পো দুধ আজকার দিনের মত ধার চেয়েছিলুম! তাই হাত দিয়ে সরলো না! দুধ থাকতে না বলে, ওর নাম শাদা দেব্যো। গায়ে ফুটে বেরুবে। আর কারও যেন সোমত্ত মেয়ে ঘরে নাই। দেখবো, দেখবো, একপো দুধ নিয়ে যেন পালিয়ে যেতুম। আট্‌কে থাক্‌বে না, কারু জন্য কিছু।”

হরিনাথ বাহিরে থেকে হাঁপির শ্বাসে যতটা সম্ভব শাসিয়ে বলিলেন, “ও মানদা! একটু থাম্‌তে বল্‌না, হলো কি ?”

অতঃপর যথাসম্ভব সমাদরে নন্দকিশোর বাবুর স্নানাহার হইল। তাকে সেই দাওয়াই একটা মাদুরের উপর একখানা কাঁথা বিছাইয়া বিশ্রামের শয্যা রচনা করিয়া দেওয়া হইল। নন্দবাবু তাহাতে শুইয়া পড়িয়া ডাকিলেন, “এসো না, মানদা তোমার পাখাখানা নিয়ে! বড় সুন্দর পাখাখানি।”

মানদাকে আসিতে হইল। আসিয়া পাখা হাতে হাওয়া করিতেও হইল। “তোমার পাখাখানি বড় সুন্দর! এ কাঁথাখানিও বুঝি তুমি

সেলাই করেছ! বেশ হয়েছে!” বলে নন্দবাবু তার মুখ পানে সতর্কে দৃষ্টি করিলেন।

মানদা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। তারপর নন্দবাবু দুই একটা কথা যা জিজ্ঞাসা করিলেন, দুই এক কথায় মানদা তাহার জবাব দিল।

যাইবার সময়ে নন্দকিশোর হরিনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, “তোমাকে কথা দিয়ে ত আমি ব্যাকুব হয়েছি। এখন কথা রাখতে গিয়ে যদি নিজেরই আবার বিয়ে কর্ত্তে হয়, আমি রাজি আছি। কথাটা রাখতে হবে, ভদ্র লোকের কন্যা দায় উদ্ধার, এ ত ছেলে খেলা নয়। তা দেখ চেষ্টা করে।”

(২)

এখন পূর্ব্ব কথাগুলি খুলিয়া বলা প্রয়োজন। নন্দকিশোর বাবু অল্প কিছু লেখাপড়া শিখিয়া, দু’চার খানা ইংরাজী বই পড়িয়াই, কলিকাতার এক সাহেব কোম্পানীর আফিসে চাকরী পাইয়াছিলেন। তখন তাহা পাওয়া যাইত। তার পর নন্দবাবুর ক্ষমতা গুণেই তিনি কোম্পানীর ছোট বাবু পর্য্যন্ত হইতে পারিয়াছিলেন। বিস্তর টাকা পয়সাও করিয়াছিলেন। যেমন উপার্জ্জন করিয়াছেন, নষ্ট তেমন কিছুই করেন নাই। তখনকার দেশটার হাওয়াই কেমন এক প্রকার ছিল। সে যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহার তাহা দাঁড়াইয়া যাইত। এত সাবান পমেটম্‌, থিয়েটার বায়স্কোপ, সাজপোষাকের আমদানী ছিল না। অনেক সাহেবের বড় বাবু বা আদালতের সেরেস্তাদার জমিদারী কিনিয়া গিয়াছেন।

নন্দবাবু উপার্জ্জন করিয়া দেশে হাজার পনর টাকার মুনফার গাঁতি করিয়াছেন, গ্রামের বাড়ীতে কোঠাবাড়ী করিয়াছেন। কলিকাতায়ও একটী বাড়ী করিয়াছেন। আর ব্যাঙ্কের ঘরে ও খাতকের কাছে কেউ বলে লাখ, কেউ বলে দু'লাখ টাকা জমা আছে। দেশে তার জ্যেঠতুত ভাই ছিলেন গরীব পাড়াগেঁয়ে লোক। তাঁহার বড় ছেলেটীকে নিজের আফিসে বেশ একটী চাকুরী জুটিয়ে দিয়াছিলেন। সে বেচারী তাহা ভোগ করিতে পারিল না, বছর দুই পরেই তাঁহারই সম্মুখে, তাঁহার বাসাবাড়ীতে বসন্ত রোগে মারা গেল। তাহার স্ত্রী আসিয়াছিলেন তাহার সেবা করিতে, তিনিও সেই রোগের সংক্রমণে দেহত্যাগ করিয়া, বৈধব্য যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। তাহাদের একটী শিশু কন্যা বাঁচিয়া থাকিল। এখন তাহাদের সংসারে থাকিল, তাহার ছোট ভাইটী ললিত, তার একটী বিধবা বোন রমা, আর সেই মাতৃপিতৃহীন শিশু মেয়েটী গৌরী। ললিত তখন ১৬।১৭ বছরের বালক মাত্র। তাহাদের পিতা তাহার বছর দুই আগে ইহলোক ছাড়িয়া গিয়াছেন। মা গিয়াছিলেন তাহারও আগে। কাজেই নন্দবাবু তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার লইলেন। সে ভার বইতে তাঁহার শক্তিও ছিল, প্রাণও ছিল। মা-বাবা-মরা মেয়ে গৌরীকে যে তিনি কি দিয়ে ভাল বাসিবেন, তা যেন তিনি ভাবিয়াই স্থির করিতে পারিতেন না। তার শিশু কণ্ঠের "দাদু" ডাক তাঁহার বড় ভাল লাগিত। সে যখন মা বাবা বলিয়া ফেলিত, তখন তাঁহার চোখ ভরিয়া জল আসিত।

* * * *

তাই গৌরীর বিধবা পিসীমা রমা সংসারে থাকিলেও নন্দবাবু গৌরীকে আপনার কাছে রাখিতেই জিদ করিলেন। তাঁহার গৃহিণীরও তাহাতে বড় আগ্রহ। গৌরীর মা বাপ দুজনেই তাহাদের সুমুখে অস্ত-

জলে শুইয়াছে! এ ছাড়া নন্দবাবু ললিতকে লেখাপড়া শিখাইতেও বেশ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এর বছর চারেক পরেই আর একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটিল। নন্দবাবুর গৃহিণী একটী পাঁচ মাসের ছেলে রাখিয়াই শাঁখা সিন্দূর নিয়ে স্বর্গে চলিয়া গেলেন। নন্দবাবুর সাধের সংসার ভাঙ্গিয়া গেল।

তখন বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রী রমা হইল এই উভয় সংসারের রক্ষাকর্ত্রী। নন্দবাবুর শিশু পুত্র নিমাইএর পালন ভার তাহারই উপর পড়িল।

নন্দবাবু কোন দিন পল্লীবাসটা একবারে তুলিয়া আনিয়া ষোল আনা সহরবাসী হন নাই। তাঁহার পত্নী থাকিতে বছরে ছ'মাসই পাড়াগাঁয়ের বাড়ীতে থাকিতেন। তখন কলিকাতার বাড়ীও তাঁহার হয় নাই, সে এই ক'বছর মাত্র হইয়াছে। নন্দবাবুও পালপার্ব্বণে বাড়ী যাইতেন। বাড়ী কল্‌কাতার খুব কাছেই, রেলে ঘণ্টা তিনেকের পথ।

নন্দবাবু যখন পরিবার নিয়া সহরে আসিতেন, তখনও বাড়ীর তোড়-যোড় বজায় থাকিত। সনাতন নামে তাঁর বাবার আমলের একজন ভৃত্য ছিল। তার উপর সংসারের ভার, বিষয় কর্ম্মের ভার সব ন্যস্ত থাকিত। ইদানিং একজন গোমস্তাও ছিল; আর একজন সন্ন্যাসী গোছের লোক, লোকে তাঁকে ভোলানাথ গোঁসাই নামে জানিত, নন্দবাবুর বাড়ীতেই থাকিতেন।

নন্দবাবুর স্ত্রীর মৃত্যু সেই পল্লী বাটীতেই হইয়াছিল। "রমা তখনই নিমাইকে কোলে আঁকড়িয়া লইলেন। গৌরী তখন বছর চারেকের হইয়াছে। নিমাইএর মার মরণে সেই বড় কাঁদিল! সে যে দিদিমা ছাড়া আর কাউকে জানিত না! নন্দবাবুও গৌরীকে কোলে লইয়া পত্নীর শোকে সান্ত্বনা লইলেন। ছেলে নিমাইতে তখন মনোযোগ করিলেন না।

তখন তাঁর বয়স বছর চল্লিশ হইবে। আত্মীয় কুটুম্ব স্বজন বান্ধব সকলেই তাঁকে পুনরায় দারগ্রহণ করিতে অনুরোধ, করিলেন। নন্দবাবু রাজি হইলেন না। তিনি তাঁর পরোলকগতা গৃহিণীকে বড়ই ভাল বাসিতেন, তাঁর ত্যক্ত আসনে আর একজনকে বসান তিনি নিতান্ত অবিচার, হৃদয়-হীনতার কর্ম্ম বলেই অনুভব করিলেন। নিমাই আছে, গৌরী আছে, রমা আছে, ললিত আছে, সংসারে আর কিসের জন্য আর একটা ভার বাড়াইবেন ?

হরিনাথ নামে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ভদ্রলোকটী নন্দবাবুর আফিসে সামান্য চাকরী করিতেন। নন্দবাবু তাহাকে একটু অনুকম্পাই করিতেন। যখন রোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া হরিনাথকে চাকরী ত্যাগ করিতে হইল, তখন হরিনাথের মেয়েটী বয়স্থা। মেয়েটী যে বড় সুন্দরী, তা নন্দবাবু জানিতেন, কয়বার তাকে দেখিয়াছেন। নন্দবাবুর দেশের বাড়ীতে যাইতে হরিনাথের গাঁয়ের মধ্য দিয়াই পথ। তিনি হরিনাথকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার মেয়েটী আমার ভাইপো ললিতকে বিবাহ দেবো : তুমি ভেবো না।"

যথাসময়ে ললিতের কাছে এ প্রস্তাব উঠান হইল ! ললিত অতি বিনয়ে জানাইল, এ সময়ে সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না। একটা কিছু উপার্জ্জনের পথ না করিয়া বিবাহ করিতে যাওয়া যে আজকাল বাঙ্গালী যুবকগণের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় এবং সারাজীবন দুঃখের কারণ, তাহা সে ভালরূপেই ভাবিয়া দেখিয়াছে। সুতরাং বিবাহ করিতে সে কিছুতেই রাজি নয়। আজকাল পরীক্ষায় পাশ করিলেই টাকা মেলে না, বিশেষ ললিতের একটা প্রধান দোষ, সে উমেদারী মোসাহেবী মোটেই করিতে পারে না। তাহাতে লোকে তাহাকে বলে, ছেলেটা পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে বটে, কিন্তু মোটেই

প্রবেশক নয়। তাই কোনও কাজ-কর্ম্মের যোগাড় করিতে পারে নাই। ললিত কিন্তু উমেদারী করিতে গিয়া, বুকের অন্তস্তলে যেখানে তার আসল মানুষটা এতকাল শিক্ষা সভ্যতায় পুষ্ট হইয়া আছে, সেইখানে আঘাত পাইয়াই ফিরিয়া আসিয়াছে। তাই সে ভাবিয়া স্থির করিয়াছে, মনুষ্যত্ব দাসত্বে বিকাইয়া স্ত্রীপরিবারের ভরণ-পোষণ ক্লেশ সহ্য করার চেয়ে, যার ঘরে স্বচ্ছন্দ অন্ন নাই, তার এমনি "উড়ো ছুটো" থাকাই ভাল। তাই ললিত স্পষ্টতই বলিল, "আমি বিবাহ করিব না।

রমা বলিল, "ছি দাদা! এতে কাকা রাগ কর্‌বেন!"

তার ইচ্ছা একটী বউ আসুক, সে একলা সংসারটা আর আগুলিয়া পারে না। ললিত বলিল, "আমার এমন কাকা নন যে, ন্যায্য কথায় তিনি রাগ করেন।"

রমা তবু বলিল, "খাওয়া পরার জন্য তোমার এত কি ভাবনা এলো? সেত কাকার উপরই ভার।"

"আমি সমর্থ হয়ে, স্ত্রী পুত্র নিয়ে কাকার অন্নেই প্রতিপালিত হবো, এটা ভাব্‌লে আমার রক্ত শুকিয়ে যায়।"

রমার দিক চেয়ে ললিতের আর একটা ভাব মনে জাগিল। বছর এগার বয়সে রমার বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। কাকাই বিবাহ দিয়াছিলেন, একটী কলেজের ছেলের সঙ্গে। সে ছেলেটীর দেহে তখনই রোগের বীজ নিহিত ছিল, তা না দেখিয়া বুঝিয়া ছেলে লেখাপড়ায় ভাল দেখিয়াই বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। বছর দুই না যাইতেই রমা বিধবা হইয়া, ভাইএর বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় নিল। তার স্বামীর বাড়ী-ঘর বিশেষ কিছু ছিল না, এক বড় ভাই ছিল, সে বিধবা ভাইবউ পোষার মত শক্তি ধরে না। সুতরাং সদ্যো-বিধবা ভাতৃ জায়াকে অন্নদায়ে তাড়াইয়া দিল। রমা বৈধব্য দুঃখে সদা ম্রিয়মানা, এখনই

একটী নববধূ মল বাজাইয়া নোলক দুলাইয়া, চেলি পরিয়া আসিবে, রমা তার কোনও উৎসবে যোগ দিতে পারিবে না! কি ব্যথা লাগিবে তার প্রাণে? ললিত মনে করিল, সে বিবাহ করিয়া পরিবার নিয়ে সংসার ধর্ম্ম করিবে, এটা বোধ হয় ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। তাহা হইলে, তার দাদা এত অল্প বয়সে মারা যাইতেন না।

নন্দবাবু বা আর কাউকে সে এত কথা বলিল না, কেউ শুনিতেও চাহিল না। মোটামুটি ললিত বিবাহ করিতে রাজি হইল না।

নন্দকিশোর বাবুও এমন কিছু বলিলেন না যে, ললিতকে এই বিবাহ করিতেই হইবে। কাজেই ব্যাপারটা কেহই একটা বিশেষ আলোচনার বিষয় মনেই করিল না।

---

(৩)

অল্পদিন মধ্যেই হরিনাথ বুঝিলেন, নন্দকিশোর যে তাঁহার কন্যা বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন তাহা বিদ্রূপ নয়, নিশ্চিতই। অবাধ্য ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর বিরক্ত হইযা, দরিদ্র স্বজনের কন্যাদায় উদ্ধারের মানসে, তিনি দয়া পরবশ হইয়াই এই ব্যাপারে বাধ্য হইতেছেন। হরিনাপ ভাবিলেন, অগত্যা সম্বন্ধ মন্দ কি? নন্দকিশোর ধনবান কর্ম্মী ব্যক্তি, বর্ত্তমানে তিনি জমিদার। বয়স যা একটু বেশী। তবে বিলক্ষণ সবল দেহ, কার্ত্তিকের মতন সুপুরুষ। মেয়ে অন্নবস্ত্রে সুখে থাকিবে, তার আর সন্দেহ নাই। এদিকে হরিনাথের শরীরের যা অবস্থা, তাহাতে তাহার চিতাশয্যায় শুইতে বড় বেশী বিলম্ব নাই। ছেলেটী ত

নেহাৎ হস্তি-মূর্খ। এমন একটা ধনবানের আশ্রয়ে এদিগকে রাখিয়া যাইতে পারিলে কাজটা মন্দ হইবে না। গৃহিণীর সঙ্গে আলোচনা পরামর্শ চলিতে লাগিল।

গৃহিণী বুড়ো বরে মেয়ে দিতে রাজি কখনও ছিলেন না। তবে কয়া যায় কি? হরিনাথের গৃহিণীর নাম মাতঙ্গী। নামটী তার পিতা মাতা সার্থকই রাখিয়াছিলেন, আকারে প্রকারে, স্বভাবে অনুষ্ঠানে মাতঙ্গী ষোল আনা ভাবেই নামে কামে মিল রাখিয়া এ বয়স পর্য্যন্ত কাটিয়ে দিয়াছেন। তাঁর রসনার বিষে জর্জ্জরিত না হইয়াছে এমন লোক সে গাঁয়ে বড় কেউ ছিল না। তিনি যার নিন্দা কুৎসা না গাহিয়াছেন, তার কপালের জোর বলিতে হইবে। মাতঙ্গী ঠাকরুণ এ পর্য্যন্ত পাড়ার প্রায় সকলেরই অনূঢ়া মেয়ে ঘর ভাঙ্গা বুড়ী হইতে চলিল বলিয়া, মেয়ের স্বজনকে সাবধান করিয়া আসিয়াছেন, আবার বিপক্ষের কাছে নথ নাড়িয়া বলিয়াছেন, "ও মেয়ের বিয়ে পুরোত ডেকে ত হবে না, মোল্লা পাদ্রী ডেকে হতে পারে।" সে গাঁয়ে মেয়ের বিবাহ দিয়া এমন বর কেউ আনিতে পারেন নাই, মাতঙ্গী-বউ যার রূপ গুণ বংশে কোনও একটা কলঙ্ক রটাইতে পারে নাই।

এখন তার নিজের কন্যার বিষয়, দশজনে দশগুণ করে শোধ নিতেছে, মাতঙ্গীর দিন রাত্রির মধ্যে শান্তি নাই। এক এক জনের কাছে অন্ততঃ দশবার সে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, মানদার বয়স সবে এই দশ বছর, খুব বাড়ান্ত বলে অমন বেড়ে উঠেছে। লোকে কিন্তু মুখের পরেই বলিয়া ফেলে, বয়স দশ বছর, তবে চব্বিশ মাসে বছর! তখন ত আর মাতঙ্গীর ভাল মানুষটী হইয়া থাকা চলে না। উত্তর পক্ষের পূর্ব্ব পূর্ব্ব চৌদ্দ পুরুষের মড়া হাড়ের বিবিধ রকম ব্যবস্থা তাহাকে করিতেই হয়। মাতঙ্গীর কণ্ঠস্বর ভাঙ্গাই থাকে, সে কথা যদি কোনও মুখর ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে

ফেলে যে, তার গলা ভাঙ্গা কেন, তবে তিনি স্পষ্টই বলেন—দেশের লোক সব শ্মশান ঘাটে না গেলে তার গলা আর সারবে না।

যা'ক, এখন নিজের চৌদ্দ বছুরে মেয়ে ঘরে লইয়া তাকে আর প্রতিজ্ঞায় অটল থাকিতে দিল না। তার প্রতিজ্ঞা ছিল তাঁর মানদাকে, এমন বরে দেবেন, যা এ গাঁয়ের লোকে কখনও দেখেই নাই। এ প্রতিজ্ঞাটার একটা সঙ্গত কারণও তার ছিল। চারিটা পাশ করা ললিতের সঙ্গে মানদার বিয়ে হইবে, এটা সে এত দিন নিশ্চয় করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছিল। এক্ষণে ললিতের এই ধষ্টামিতে সে হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেল। আগেই সেই নিরীহ ছেলেটার বিদ্যা বুদ্ধি রূপে গুণের উপর বাজ পড়ার ব্যবস্থা করিয়া, তার যে বউ হবে, তার শাখা বিবাহ বাসরেই ভাঙ্গিবার ব্যবস্থার জন্য তেত্রিশ কোটী দেবতার দরবারে আর্জি করিল। তারপর বলিল, "আচ্ছা, যা'ক, মানদা নন্দকিশোরের ঘরে, তার পরে ঐ সব জ্ঞাত কুটুম এসে বুঝি পাতড়া মার্‌বেন,—তা দেখা যাবে!"

কথাটা এ পক্ষের কাণেও উঠিল। ললিতও শুনিল, হরিনাথের মেয়ে কাকা নিজেই বিবাহ করিতেছেন। রমা শুনিয়া বলিল, "দাদা, সর্ব্বনাশ হয়!" ভৃত্য সনাতন আসিয়া বলিল, "ললিতবাবু, এখন উপায়?" ললিত ভাবিল, আমি এর কি করিতে পারি? আমি কি এর জন্য কোনও অংশে দায়ী আছি? একদিন মাত্র কাকা আমায় বলেয়াছিলেন, এই বিয়ে করিতে! অথচ এখন তিনি প্রকাশ করিতেছেন, হরিনাথের মেয়ে ললিতকে বিয়ে দেবেন বলিয়া তিনি কথা দিয়াছিলেন, ললিত আমার কথা রাখিল না, তখন নিজে বিয়ে না করে করি কি? এমন ভাবে তিনিও আমার কোনও দিন বলেন নাই। আমার কাকা মনে ব্যথা পান, এমন কাজ করে আমিত স্বর্গ সুখও কামনা করি না।

কিন্তু কি জানি,—"রমা, তুমি কাকাকে বল যদি আমার দোষেই এই ব্যাপার হতে যেয়ে থাকে, তবে আমি বিয়ে কর্ত্তে রাজি আছি।"

রমা বড় খুসি হইয়া, বড় ভরসা লইয়া কাকাকে গিয়া বলিল, "কাকা, দাদা বিয়ে কর্ত্তে রাজি হয়েছেন।"

নন্দবাবু গম্ভীর হইয়া উত্তর করিলেন, "না না, তাঁর কিছু কর্ত্তে হবে না। আমি এতদিন দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেছি!"

রমা যেন ভয়ে মুশড়ে গেল, তবু বলিল, "দাদা না বুঝে করেছেন, মাপ করুন। বিয়ে তিনি করবেন।"

"এখন করবেন বই কি! তিনি পারেন, তাঁর কাকা যাকে বিবাহ কর্‌বে বলে পাকা দেখে এসেছে, তাকে বিয়ে কর্ত্তে, কিন্তু আমি যাকে নিজে বিয়ে কর্‌বো বলে মুখ দিয়ে কথা বার করেছি, তাকে ত আমি পুত্রবধূ কর্ত্তে পারি না।"

রমা আশ্চার্য্য হইয়া নীরব রহিল! সনাতন সেখানে ছিল, সে বলিল, "এ আর এমন দোষের কি হয়েছে।"

আগুনের হাড়ীর মতন মুখ করিয়া নন্দবাবু ধমক দিয়া বলিলেন, "সনাতন, সকল কথার ভিতর জবাব কাটতে এসো না। এ সব কাজে ছোট লোকের বুদ্ধি চলে না।"

একি! জীবনেও সনাতন এতবড় ধমক বাবুর কাছে কখনও পায় নাই!

সবাই ভাবিল, "নখের ছিদ্রে কুড়ুলের কোপ" হইল। ললিত একটু ভাবিয়া হাসিল! তারপর সে যেন বড় কড়া হইয়া দাঁড়াইল। সকলের কাছে সেধে সেধে বলিতে লাগিল, "আমি কখনও বিয়ে কর্ত্তে পারবই না, তাতে যাই হোক। এতে কাকার অপমান অসম্ভ্রম হ'লে আমি দায়ী নই। তাঁর কথার মান রাখতে গিয়ে আমি আমার ভবিষ্যৎ

জীবনটা নষ্ট কর্ত্তে পারি না। এতে তিনি অসন্তুষ্ট হ'ন, আমি নাচার। তিনি কথা দিয়ে থাকেন, তিনি নিজেই বিয়ে করুন, তাঁর ত বিয়ের বয়স যায় নি! তাঁর মত লোকের এ করা উচিত। যখন না জেনে শুনে একটা লোককে ভরসা দিয়েছেন, তখন নিজে একটু মুস্কিলে পড়েও তাঁকে কথা রাখতে হবে বই কি। তা বলে, আমাকে দিয়ে যে ভূত ছাড়াবেন, সেটী হচ্ছে না।"

ললিত যখন এ কথা গুলি বলে, তখন তার কণ্ঠস্বরটা যেন যাত্রার দলের অভিনেতার মত, মুখের ভাবটা কথার ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে না। রমা বলিল, "দাদা! বিয়ে না কর্‌বেন, নাই করবেন। মিছি মিছি এসব কথার এমন ভাবে আলোচনা করে কাকাকে আরও চটিয়ে দিচ্ছেন কেন?"

ললিত হাসিমাখা ক্রোধেই উত্তর করিল, "তুই যা, সব কাজে পরামর্শ দিতে আসে। আমি কাকাকে চটিয়ে দিচ্ছি কি খুসি কচ্ছি, তার জবাব তোকে দেব না। তা বলে, তোরা কিন্তু চটে থাকিস্ না। বিবাহে যা রীতি ব্যবহার, কৌলিক আচার আছে, তার অনুষ্ঠানের যেন ত্রুটী না হয। মনে কর, আমরা ছেলের বিয়ে দিচ্ছি। জানিস ত, শান্তনু রাজা বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করেছিলেন, তাই ত এত বড় মহাভারত পুঁথিখানা ব্যাস দেব লিখতে পেরেছিলেন।"

রমাও হাসিয়া বলিল, "তা বটে, শান্তনু রাজা বিয়ে না কর্‌লে, কুরুকুল পাণ্ডব কৌরবে ভাগও হতো না, এতবড় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটাও ঘট্‌তো না।"

"আর সেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা ঘটান ভগবানের অবতার কৃষ্ণ ঠাকুরের একান্ত ইচ্ছা!"

বলিয়া ললিতমোহন নদীর তীরে বেড়াইতে গেল। নিমাই তার

সাথে যাইতে চাহিল, রোজই যায়, আজ ললিত তাকে ধমক দিয়া কাঁদাইয়া রাখিয়া গেল।

(৪)

শুভ বিবাহ হইয়া গেল। নন্দকিশোর বাবু বিবেচনা মত্তই খরচ পত্র করিতে বলিলেন, লোকে যাহাতে নিন্দা না করে। গ্রামের ধাই বুড়ী আসিয়া বলিল, "বাবু, এ বাড়ীর বিয়ে কাজে আমি পাঁচ টাকার কম নেই না।" বাবুও বলিলেন, "আচ্ছা, তোমাকে আর ক্ষুণ্ণ করে কি হবে।" ধাই বুড়ি পাঁচটী টাকা হাতে পাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গেল, "বাবু, আর দশটা বিয়ে কর।"

বিবাহ করিয়া নন্দবাবু নববধূ লইয়া কলিকাতার বাড়ীতে গেলেন। আর কাউকে সঙ্গে লইলেন না। কেউ যাইতেও বড় চাহিল না। গৌরীর দাদুর সঙ্গে যাবার ইচ্ছাটা ছিল বটে, কিন্তু নতূন দিদিমা তাকে সে দিন বড় ব্যথা দিয়া কাণমলা দিয়াছিলেন বলে তত উৎসাহ দেখাইল না।

বিয়ের আচার ব্যবহার, আশীর্ব্বাদী, অধিবাস, দধিমঙ্গল, ছালনা তলা, কড়ি-সারা, পাশাখেলা, ফুলশয্যা, দশ বাঁধন ইত্যাদির ভিতরে থাকিয়া মানদা এ ক'দিনে ঠিক বুঝিতে পারে নাই যে, ভাল হলো কি মন্দ হলো! দশদিনের মধ্যেই সে যোড়-সমেত বাপের বাড়ী গিয়াছিল। সেখানে তার মা জামাইকে বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে দিলেন, "দেখ বাপু, যা হ'লো ভালই হলো। তবে কিন্তু আমার মানদা ঐ সব শত্রু পুষতে পার্‌বে না? কি শত্রুতাটাই কল্ল তোমার গুণের ভাইপোটী! এখন যে মেয়ে আমার ওদেরই ভাত বাড়তে যাবে, তা কিন্তু পার্‌বে না।"

মানদা কলিকাতায় আসিল। মস্ত দোতালা বাড়ী, খাট কেদারা, আলমারি আলনা, ছবি ফানুসে বাড়ীটী কি সুন্দর সাজান! কল টিপলেই আলো জ্বলে। বামনে রাঁধে, ঝি স্নান করাইয়া দেয়, সাজাইয়া চুল বাঁধিয়া দেয়! তার জন্যই একজন নতুন ঝি নিযুক্ত হইয়াছে। নতুন নতুন মানদার মন্দ লাগিল না। ঝি মাগী একদিন চুল বাঁধিয়া দিয়া, ক্রিম মাখাইয়া, খয়েরের টিপ দিয়া, আয়নাটা হাতে দিয়া বলিল, "দেখ মা! রূপখানা যেন উছলে পড়ছে! সুন্দরী বটে তুমি। কপালে ছিল বুড়ো বর কর্‌বে কি?"

কথাটা শুনে মানদার মনে একটা বড় আঘাতের ব্যথাই অনুভূত হইল! এখন সে ব'সে ব'সে ভাবে, "আমার রূপ গুণের পুরস্কার বুঝি এই হ'লো? এই টাকা কড়ি, কোঠাবাড়ী সোণা মণি! এ না হ'য়ে শুধু শাঁখা হাতে আমি যদি ললিতের ঘরে যেতাম, সে এর চেয়ে কত ভাল ছিল? ললিত কত সুন্দর! কি মধুর কথাগুলি তার? সে আমায় কাকী মা বলে প্রণাম কর্ত্তে এসেছিল! ছি! ছি! চৌদ্দ বছুরে মেয়ে আমি, বাইশ বছরের এতবড় একটা যুবকের প্রণাম আমি গ্রহণ করবো কেমন করে? ললিতের এমনটা করতে আসা উচিত হয় নি। তার লজ্জা বোধ হওয়া উচিত ছিল।

মধ্যে একদিন নন্দকিশোরবাবু মানদাকে বাঙ্গালী মেমসাহেব সাজাইয়া, মোটরে চড়াইয়া থিয়েটার দেখাইয়া লইয়া আসিলেন। অনেক বাবু আসিয়াছিলেন—যুগল মিলনে থিয়েটার দেখিতে। সে মেয়েগুলি কেমন ঘোমটা খুলিয়া নিঃসঙ্কোচে দয়িতের সাথে হাসি তামাসা রঙ্গরসে ভরপুর ছিল। মানদা তেমন পারিল না। বাবার বয়সী স্বামী, তার সঙ্গে কি এমনটা পারা যায়? ছোকরাগুলি তাহাদের পানে আড়নজরে তাকাইতেছিল। তারা কি বৃদ্ধ স্বামীর

বালিকা স্ত্রী দেখিয়া রহস্যোৎসুক নেত্রে কুটিল কটাক্ষ এমনই হানিতেছিল? কত তরুণীও তাহাদের দিকে কৌতূহল নেত্রে তাকাইয়া বুঝি হাসিয়াছিল! কি বিপদ! স্বামী বুদ্ধিমান্ হইয়া তাকে দশের সম্মুখে বাহির করিয়া তার ভাগ্যটা এমন করিয়া জ্ঞাপন করিলেন কেন? তাহার কি দশের সম্মুখে প্রকাশিত হওয়ার অদৃষ্ট? আত্মীয় স্বজনের চক্ষুর অন্তরালে থাকিবে বলেই ত তাহারা কলিকাতায় আসিয়াছে! মানদার থিয়েটারের অভিনয় দেখিয়া কিছুমাত্রও আনন্দ বাড়িল না; বরং বুকটা যেন বুকের মধ্যে দমিয়া যাইতে লাগিল। নন্দবাবু ভাবিয়াছিলেন, এতে মানদার না জানি কতই আনন্দ স্ফূর্ত্তি বাড়িয়া যাইবে। নবীনা কিশোরী, কত প্রেমমধু ভরা ফোটা-মুখী পদ্মিনী, কত প্রেমের পিয়াসা, রঙ্গের কল্পনা তাহাব প্রাণে! নন্দকিশোর বাবুর এ বয়সে তাহাকে গৃহিনী করা যা একটু অবিচার হইয়াছে, তিনি এই সব অবাধ আমোদ প্রমোদ দিয়া তার সমতা করিতে চান। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা, মানদা যাহাতে বুঝিতে পারে যে সে তার রূপগুণ বয়সের যোগ্য স্বামীর ঘরেই আসিয়াছে। তার স্বামী বয়সে একটু আগাইয়া গেলেও আজকাল শিক্ষা-সভ্যতা, আদব কায়দার মাত্রা যতটা আগাইয়া পড়িয়াছে, তাতে তিনি একটুও পিছনে পড়িয়া থাকেন নাই। মানদা কিন্তু ভাবে, এটা তার নেহাৎ বাড়াবাড়ি! সারাদিন যে তিনি পোষা বিড়ালটীর মতন, এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স নিয়া পনর বছরের কিশোরীর পিছনে পিছনে ঘুরিবেন, এটা তাঁহার অতি অমার্জ্জনীয় বেয়াদবি। এতে অনেক সময়ে মানদার শান্তি রক্ষা করা দায় হইয়া পড়ে। তবে মানদার ইহাতে মুখে কিছু বলিবার নাই; সে যে হিন্দুর ঘরের বিবাহিতা পত্নী, তাহাকে পতির অনুগামিনী হইয়া চলিতেই হইবে। নইলে সে ধর্ম্মে

পতিতা হইবে, সমাজে কলঙ্ক রাখিবে। এ বিশ্বাস সে কখনও ক্ষুণ্ণ করিবে না।

তবে কলিকাতা বাস তার মোটেই ভাল লাগিতেছে না। সে কাচা ঘরে থাকিত, কাচা রাস্তায় বেড়াইত, বাবার কাচা ঘরের মেজেয় সুধু মাছুর বিছাইয়া শুইত। ডাল ভাত, শাক ভাত, ফেন ভাত খাইত, তুই এক দিন তাও সময় মত জুটিত না। বাগান থেকে কাঠ কুড়াইয়া আনিয়া সে রাঁধিত, টোপা কুল, বুনো পেয়ারা, আম, জাম কুড়াইয়া পাড়িয়া খাইত, সে ত ভালই ছিল! তার পর আজ বছর খানেক ধরিয়া সে কল্পনা করিয়া আসিতেছিল, এমনি একটা পাকা বাড়ীতে পাকা গৃহিনী হইয়া সে প্রাণ ভরিয়া প্রেমের খেলা খেলিবে, দিনে দশবার অভিমান করিবে,—প্রতি বারই তার দয়িত আসিয়া কপালে ললাটে অধরে শত চুম্বনের রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়া সে অভিমান ভাঙ্গিয়া দিবেন। এ কথা তার জাগিয়াছিল সে দিন, যেদিন হইতে সে শুনিতে পাইয়াছিল—ললিত তার পাণিগ্রহণ-প্রয়াসী। নইলে অন্নহীন দরিদ্রের তুহিতা সে,—এমন আকাশ কুসুম কল্পনা সে না করিলেও পারিত। যে তাকে এমন কল্পনা করিবার প্রবৃত্তি দিয়া তাকে এমন ভাবে পায়ে ঠেলিল, সে কি এমনটা করিয়া কি খুব পুণ্যের কাজই করিয়াছে? এই যে তার মর্ম্ম ছেদী আশা ভঙ্গ, এ কি তার কোনও স্বকৃত পাপের ফল, না অন্যের নিষ্ঠুর—অকারণ নিষ্ঠুর অবজ্ঞার পরিণাম? যা'ক, সহরের এ সাজ-সজ্জা ভোগবিলাসের চেয়ে পল্লীভূমির শাক পাতাই আমার ভাল। সেখানে প্রত্যহ ললিতমোহন সকাল সন্ধ্যায় বড় সুন্দর গান করে। তুটো ছেলে মেয়ে আছে, তারা হাসে নাচে। এর চেয়ে সে ভাল।

মানদা বলিল, "আমি দেশের বাড়ীতে যাব।"

নন্দকিশোর বলিলেন,—কেন? সে যায়গা ভাল না, ম্যালেরিয়া হয়, পুকুরের পচা জল।"

"তা হোক্, ছেলেটা পেলেটা আছে। তাহাদের রেখে এখানে কি আরাম।"

"ও, তাই বলো,—বিধাতার খেলা, বিধাতার খেলা কি না! নিমাইএর উপর মন গিয়েছে। তা না যেয়ে কি পারে? সতীনের ছেলে হলে কি হয়, ছেলে ত! এমনি হ'বে জেনেই ত আমি এমনটা কল্লাম। তা যেও, আমি নেহাৎ নাচার হয়েই ত ছেলেটাকে পরের হাতে স'পে দিয়েছি। পরে কি পরের ছেলের আদর বোঝে? আচ্ছা, নিমাই গৌরীকে এখানে নিয়া আসি না কেন?'

এমন লোকের সঙ্গে মানদার কথা বলাই দায়! একবারে সৃষ্টি-ছাড়া বুদ্ধি! মানদা বলিল "না না, যেমন দুরন্ত ছেলে মেয়ে, এখানে এনে রাখা চল্‌বে না, কোথায় গাড়ির তলে পড়ে মারা যাক। তার পর একটা কলঙ্ক! না হয়, তুমি কিছুদিন আমায় বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও। তোমার নিমাই-গৌরী দিয়ে আবার কাজ নেই।"

"না না অভিমান করো না। আচ্ছা চল তোমায় রেখে আস্‌ছি দেশের বাড়ীতে! তবে আমার বড় কষ্ট হবে; তা কি করা যায়? যেতে হবে মাঝে মাঝে! তোমার চোখের আড় করে বেশী দিন ত থাক্‌তে পারবো না।"

নন্দকিশোর মানদাকে নিয়া বাড়ীতে আসিয়া আগে তার বস-বাসের সুবিধা সুবন্দোবস্ত করিলেন। ভৃত্য সনাতনকে ডাকিয়া বলি-লেন, "সনাতন, শুনেছ তোমাদের নতুন গিন্নীর খোট্? তিনি কল্-কাতায় থাক্তে আর কিছুতেই রাজি হলেন না। বলেন, নিমাই গৌরীকে দূরে রেখে একলাটী কল্কাতায় থাক্তে তাঁর ভাল লাগে না। এরই মধ্যে নিমাইএর উপর টান বসেছে!"

সনাতন বলিল, "তাই ত, লক্ষ্মী মেয়ে।"

তারপর রমাকে ডাকিয়া মানদাকে সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "দেখ মা রমা! তোমাদের কাকীমাকে ত আমি কল্কাতায় রাখ্তে পাল্লাম না। তোমাদের কাছ ছাড়া হয়ে ওনি থাক্তেই চান না। খুব স্নেহে ভরা প্রাণ কি না? বিশেষ নিমাইএর উপর যে ওঁর কি স্নেহটাই বসেছে, তা দেখ্লে তুমি অবাক হয়ে যাবে। আমিও তোমাদের কাছ-ছাড়া করে ওঁকে রাখতে চাই না। তবে কথাটা হচ্ছে কি, দুঃখ-কষ্টের সংসার থেকে এসেছেন কি না, ওঁর শরীরটা তত ভাল নয়, তাই ভেবেছিলুম কলকাতায় কিছুদিন রেখে ওঁর শরীরটা একটু ভাল করে আনি। এখনে দু'জনে বেশ মিলেমিশে সংসার ধর্ম্ম কর্বে আর কি? নিমাই যেন সর্ব্বদাই ওঁর কাছে কাছে থাকে। এতে অবশ্য তুমি কিছু মনে কর্বে না। যার ধন, তার হাতে যাওয়াই ত ভাল।"

পাগলা সন্ন্যাসী ভোলানাথ আজ বিশ বৎসর বাহির বাড়ীর নাকা-রীতে থাক্তেন। সকলেই তাকে আদর করিত, ভক্তিও করিত।

তিনি তাঁর ঝুলি কাঁথা লইয়া বাহির হইয়া যাইতেছেন দেখিয়া সনাতন বলিল, "কোথা যাচ্ছ, দাদা ঠাকুর!"

ভোলানাথ হাসিয়া বলিলেন, "আর এক যায়গায়!"

"কেন এখানে কি হলো?"

"বড় গরম?"

"তা, বাবুকে একবার বলেই নয় যাও।"

"কেন? বেয়াদবি হবে? তা হোক্।"

ভোলানাথ চলিল। সনাতনের চক্ষে জল আসিল। আজ বিশ বছর ভোলানাথ ও সনাতন এক ঘরেই থাকে, ভোলানাথ বড় মিষ্ট শ্যামা সঙ্গীত গান করেন, সনাতন শুনে শুনে মুগ্ধ হয়। এই ক'বছরে, সনাতন ভোলানাথকেই গুরু করিয়া, মায়ের উপাসক হইয়া পড়িয়াছে। এর আগে সে, শাক্ত ছিল কি বৈষ্ণব ছিল, তা সে নিজেও জানিত না। ভোলানাথের এমন আকস্মিক নির্দ্দয় বিদায়ে সনাতন বড়ই ব্যথিত হইল। সে রাস্তায় আগাইয়া গিয়া ভোলানাথের সুমুখে যোড়-হাতে দাঁড়াইয়া বলিল, "আমায় একেলা ফেলে গেলে দাদা ঠাকুর!" ভোলানাথ হাসিয়া বলিলেন, "তুমিও মানে মানে আমার সঙ্গে এসো না?"

তা কি করে হয়? সনাতন যে এ বাড়ীর ত্রিশ বছরের চাকর। চাকর কি! সে এই বাড়ীরই লোক! সে আসিয়াছিল উড়িষ্যা দেশ হইতে একটা বড় দুর্ভিক্ষের বছরে। তাহার দেশে আর কেউ ছিল না। তখন তার বয়স ছিল পনর বছর। সেই থেকে সে অনেক বাড়ীতে পেটে ভাতে বা আধ পেটা খাইয়া খাটিয়াছে। কেউ কিছু মাহিনে দেবে বলে শেষে আর দেয় নাই। তারপর নন্দকিশোরের পিতা তাকে যত্ন করিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং মাসে মাসে তার

তিনটী টাকা মাহিনে তিনি না চাইতেই যাচিয়া দিতেন। সেই থেকে সনাতন এই বাড়ীতেই থাকিয়া গিয়াছে। নন্দবাবু তার বয়সের ছোট। তাঁকে সনাতন কোলে-পিঠে করিয়া পালন করিয়াছে। কতদিন সে তার মাহিনের টাকা দিয়ে নন্দকিশোরকে মুড়িমুড়কি কিনিয়া খাওয়াইয়াছে, তাকে ঘুড়ি কিনিয়া দিয়াছে! ভোলানাথ চলিয়া গেলেন বলে সে যাইতে পারে না। নন্দবাবুর প্রথমা স্ত্রী যখন মারা গেলেন, তখন তিনি মরণ-শয্যায় শুইয়া সনাতনকে কত কথাই বলিয়া গিয়াছেন; তাঁর বুকের মাণিক নিমাইকে সনাতনের কোলে দিয়ে কত কান্নাই কাঁদিয়া গিয়াছেন, মুখ ফুটে কিছু বলে যেতে পারেন নাই। সনাতন কি যাইতে পারে এত সহজে!

সনাতনের এখন ষাট বছর পার হইয়া গিয়াছে, কাজ কর্ম্ম তর্ত্ত করিতে পারে না। খাটিয়া খাইবার তার আর দরকার নাই। তার এতকালের খাটুনির টাকা জমিয়া হাজার খানেক টাকা হইয়াছে। সে মাঝে মাঝে তার পেটরা খুলিয়া টাকা গুলি নাড়ে চাড়ে, আর মনে মনে সঙ্কল্প করে; আস্‌ছে বার যাত্রার দিনই সে বৃন্দাবনে যাত্রা করিবে। কিন্তু এই বাড়ীর আম গাছটী, ফুলের লতাটীর উপর পর্য্যন্ত তার বড় দরদ! এ সব ছাড়িয়া যাইতে তার পাঁজর ভাঙ্গিয়া আসে। তার যাওয়া হয় না, আর এক রথ যাত্রার অপেক্ষা করে, বাঁধা বিছানা আমার পাতিয়া ফেলে। ভোলানাথের বিহনে সনাতন বড় ব্যথা পাইল, কিন্তু বাসা ছাড়িতে পাড়িল না।

নন্দবাবু দু'দিন থাকিয়াই কলিকাতায় গেলেন। তার ব্যবসায় নষ্ট হয়, চাকরী থাকে না। মানদা এখানে এসে যেন নূতন নূতন বড় শান্তি পাইল। যেন নিতান্ত কোনও অরুচিকর কর্ত্তব্য হইতে সে ছুটি পাইয়া বিশ্রাম লাভ করিল।

এখানে আসিয়াই সে অকপটে সংসার ধর্ম্মে মনোযোগ করিল। রমার হাত হইতে হাড়িকাঠি কাড়িয়া লইল। সে ত রান্না বান্না, ঘর-কন্নার কাজ করিতে অপটু নয়। মানদা রান্না করে, ভাত বাড়ে, ঠাঁই করে,—সকলকে পরিবেশন করে। সকলেই মান্‌দার রান্না খাইয়া যশ গায়! ললিত খাইতে বসিয়া প্রত্যহই বলে, এ কাকী মা ঠিক যেন সেই কাকীমার মতই রাঁধেন।

মানদার ঘরকন্নার এমন মনোযোগ ও পটুতা দেখিয়া রমা বড়ই আহ্লাদিত। সে আপন পুত্রবধূটীর মতন যত্ন আদরে মানদার সেবা করে; তার সকল কাজেই সহায়তা করে। তার চুল বাঁধিয়া দেয়, সিন্দুর পরাইয়া দেয়, তাকে নিয়ে গঙ্গা পূজা করে। আর এমন সুন্দরী গুণবতী মেয়েটাকে কাকাবাবু এ বয়সে বিয়ে করে যে কত বড় অন্যায় করিয়াছেন, এ কথা সে মুখে স্পষ্টতঃ না বলিলেও, তার ভাব ভঙ্গিতে তাহা অনেকটা প্রকাশ হইয়া পড়ে! রমা বড় আপনা-ভোলা খোলা প্রাণের মেয়ে।

কেবল একটা কাজে মানদার মোটেই উৎসাহ দেখা যায় না; নিমাইকে মানদা আদর যত্ন কিছুই করে না। নিমাই কাছে গেলে সরাইয়া দেয়, মা ব'লে ডাক্‌লে মুখ ফিরাইয়া নেয়। রমা যতই নিমাইকে মানদাকে আঁকড়িয়া ধরিতে উৎসাহিত করে, মানদা ততই ছিনিয়া টানিয়া সরিয়া যাইয়া তাকে দমাইয়া দেয়।

মানদা চেষ্টা করিয়াছে—নিমাইকে স্নেহ যত্ন করিবার চেষ্টায় সে মনের সঙ্গে খুবই লড়াই করিয়াছে। কিন্তু তাহা তাহার অসাধ্য। নিমাইকে দেখিলেই তার মনে আসিয়া পড়ে, সে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। সে দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াছিল, তার বাপ মা টাকা দিয়া ভাল বর জুটাইতে পারেন নাই, তাই তার যোগ্য কেউ তাকে গ্রহণ করে নাই। বৃদ্ধ

নিমাইএর বাবা দয়া করিয়া তার নারী জীবনটার ভার নিয়াছেন! এ কল্পনাটা যখনই তার মনে আসে, তখন তার ইন্দ্রিয়গুলি যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সে কেবলই ভাবে, ললিত তাকে কেন উপেক্ষা করিল? ললিত ত নির্দ্দয় পাষাণ প্রাণ ব্যক্তি নয়! অতি ইতর অন্ত্যজ ব্যক্তির দুঃখ দেখিলে তার প্রাণ কৃপায় গলে যায়! গ্রামে কারু পীড়া হইলে, খবর পাওয়া মাত্র ললিত তার সেবায় ছুটে যায়। কত দিন মানদা ললিতের বাড়া ভাত নিয়া বসিয়া রহিয়াছে, সে কোন্ চাষার বাগদীর ছেলের ব্যারামে ডাক্তার ডাকিতে গিয়া তিন প্রহর বেলা কাটাইয়া আসিয়াছে। কারু প্রতি ত ললিতের রুক্ষ নীরস ব্যবহার দেখি না। তবে আমায় এমন পদদলিত করিল কেন? ললিত ত আমায় আগেও দেখিয়াছে! আমায় রূপবতী বলিয়া ব্যাখ্যাও করিয়াছে, সেকি বুঝিতে পারে নাই, তার উপেক্ষায় আমার কি সর্ব্বনাশ হইতেছে! ললিত! আজ তুমি আমার রান্না খাইয়া, ঘর কান্নার কাজ দেখিয়া আমায় ব্যাখ্যা কর,—কি কঠোর পরিহাস তোমার! দেখ্‌তে যদি আমায় হৃদয় খুলে, যে হৃদয় সাজিয়ে রেখেছিলাম তোমার উপহারের ডালি করে —তবে বুঝতে আমি কত মধু সম্ভার করে রাখিয়াছিলাম! ললিত! এর শাস্তি কি তুমি পাবে না?



নন্দকিশোর বাবু সুন্দরী তরুণী ভার্য্যার সঙ্গ ছাড়া হইয়া কিছু অশান্তি বোধই করিলেন। তখনও তাঁর জীবন প্রবাহে যৌবন-জোয়ারের একটু ক্ষীণ গতি ছিল।—ছিল বলিয়াই ত মানদার রূপ-যৌবনের ভোগে তাঁর এতটা প্রবল লালসা জন্মিয়াছিল। দেহে যত দিন তাজা বল থাকে, ততদিন মানুষ সাহস করিয়া সকল রকম বিপক্ষের বিরুদ্ধেই দাঁড়াইতে পারে। বলে ভাটি লাগিলেই উদ্যমের হ্রাস হয়। তখন শৃগাল দেখিলেও যেমন সে ব্যাঘ্র-ভ্রমে চমকিয়া ওঠে, মনের সমুখে একটা কিছু এসে পড়িলেও সে তেমনি বিশেষ একটা নাড়াচাড়া দিয়া যাইতে উৎসাহ পায় না। এমনি সময়েই মানদার রূপ পড়িয়াছিল নন্দকিশোরের চোখে! মানদাকে ভোগ করিবার জন্য তার প্রবল তৃষ্ণা!

আবার এই তরুণীর যৌবন-মধু ভোগ করিতে গিয়া তাঁর অশান্তি-উদ্বেগও বড় বেশী। সর্ব্বদাই তার মনে হয়, কিসে জানি কিশোরী ব্যথা পান, কি না করিলে বুঝি তার মানের মত পূজা হয় না! তাই নন্দকিশোরের পক্ষে মানদা নিতান্ত জ্বর বিকারে "বিলের বারি" গাছের না হইলেও, মানদার সেবায় তাঁর নিরচ্ছিন্ন আরাম ছিল না। অল্পদিন পরেই নন্দকিশোর আসিয়া দেখিয়া গেলেন; মানদা কেমন আছে। সকলে এক বাক্যে বলিল, "লক্ষ্মী মেয়েটী, কাজে কর্ম্মে সেবা যত্নে এমন আর মেলে না!" শুনিয়া নন্দকিশোর চরিতার্থ হইলেন। কেবল নিমাই বলিল, "মা মোটেই ভাল না, আমার উপর কেবলই রেগে যায়।" নন্দবাবু তাতে সেই সাত বছরের ছেলের উপর খুবই রাগিয়া

গেলেন। বল্লেন, "পাজি ছেলে কোথাকার!" নিমাই ছল্ ছল্ নেত্রে দাঁড়াইয়া ভাবিয়াই পাইল না, বাবাও এত রাগিলেন কেন?

পরদিন সকালে রমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "রমা! ও লোকটা একটু হাবা ধরণের আছে। তাই বলে তোমরা এত সুবিধা নিও না। সংসারের সকল কাজগুলিই ওর ঘাড়ে চাপিয়ে, নিশ্চিন্ত হয়ো না। নরম শরীর, অতিরিক্ত খাটুনিতে একটা অসুখ বিসুখ কর্ত্তে ত পারে! তখন ত আমারই জ্বালা।"

রমা শুনিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। মানদা আসিয়া বলিল, "ছি! এ তোমার কেমন কথা!"

"কেন! মন্দ কি বলেছি?"

"তবে পদে পদেই আমার এমনি শূল বিঁধাবে! তোমার সঙ্গে আমার কি শত্রুতা ছিল?"

"ওটা বিধাতার কলম মানদা, বিধাতার কলম।"

"কি ছাই বোঝ, আর কি ছাই বলো। এই যে রমাকে এত গুলো কথা বল্লে, এতে ওরা কি ভাবল? ভাবল, ওরা যেন আমাকে জবরদস্তি করে খাটুনি খাটায়, আমি তাই তোমার কাছে লাগিয়েছি। এখনই ওরা কি বলাবলি করবে না যে, বুড়ো বয়সে বিয়ে করে তোমার বুদ্ধি লোপ হয়ো গেছে! মোদ্দা, এমন করবে ত তুমি আর বাড়ী ঘরে এসো না।"

নন্দকিশোর ভাবিলেন, "তাইত, প্রিয়তমা আমার কত লোক-লজ্জাভয়ে কাতর? এই জন্যই ভেবেছিলাম, কলকাতায় কাছে কাছে রাখি।"

* * *

গ্রামে একটা ডাক্তারখানা বসাতে হইবে, ললিত সেজন্য কয়জন

গ্রামবাসীকে সঙ্গে লইয়া চাঁদা আদায় করিতে গিয়াছিল। অনেক রাত্রিতেও বাড়ী ফিরিল না। সকলের খাওয়া দাওয়া হইয়া গেল, ললিতের ভাত হাড়িতে চাপা দিয়া রাখিয়া মানদা বসিয়া রহিল। সে দিনটা বড় গুমোট গিয়াছে, বৈশাখ মাসের শেষটাই হইবে। সন্ধ্যা বেলায়, অল্প একটু মেঘ হইয়া ছোট একটু ঝড় ছাড়িয়াছে ও ফোঁটা কয়েক জল পড়িয়াছে। তাতেই পৃথিবীটা ঠাণ্ডা হইয়াছে। যাহাদের খাওয়া দাওয়া হইয়াছে, তারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এমন দিনে বড় ঘুম আসে। রমাও আজ নিমাইকে ঘুমাইতে লইয়া গিয়া নিজেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নইলে সে মানদার খাওয়া দাওয়া না হইলে ঘুমায় না।

মানদা ললিতের ভাত লইয়া বসিয়া আছে, একটুও বিরক্ত হয় নাই। সে তার মনের সাথে কথা বলিতেছে, এমনি করিয়া যদি সারাজীবন ভাত লইয়া প্রতি রাত্রি জাগিয়া থাকিতে হইত, তা হইলে সে অনিদ্রায় এ দেহ ভাঙ্গিয়া যাইত না। একটী,—একটী মাত্র চুম্বনের ভরসা, চোখের কোণে লেগে গেলে, আর কি আস্‌তে পার ত নিদ্রা সে বক্ষে! কিন্তু নিদ্রা চক্ষেই আসিল। মানদা সেই রান্নাঘরে স্তিমিত প্রদীপের পাশে মাটীতেই আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পড়িল!

অনেক রাত্রিতে বাড়ী আসিয়া ললিত দেখিল—বাড়ীতে কারু সাড়া শব্দ নাই, রান্নাঘরে আলো জ্বলিতেছে মাত্র! ভেজান দুয়ার খুলিয়া ললিত ঘরে প্রবেশ করিল। "আহা—! কাকী মা একলাটী আমার ভাত নিয়ে বাটীতেই ঘুমিয়ে পড়েছেন! কি অন্যায় আমার!" ললিত দীপটী উস্কাইয়া দিল। কাকীমাকে ডাকিল না। চাহিয়া দেখিল, দীপ্ত দীপালোকে ঘুমন্ত সুন্দরী মানদার রূপরাশি কি সুন্দর ফুটিয়াছে! এতদিন ললিত এমন স্পষ্ট ভাবে মানদার মুখ দেখে

নাই! দেখিল, একখানি বাহুর উপর কপোল ন্যস্ত করিয়া তরুণী ঘুমাইতেছে, যেন রাশীকৃত বেল কুসুম গঠিত একখানি প্রতিমা ধূলায় গড়াইতেছে। গণ্ডদেশে বাহুর চাপ লাগিয়া ওষ্ঠাধর দুটী ঈষৎ ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তার মধ্য দিয়া দুই পাটী দন্তের আভা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। অন্য গণ্ডে দুটী মশকদংশনের দাগ, সেখান থেকে যেন রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছে। অঙ্গের বসন নিদ্রাবেশে অসংযত, অবগুণ্ঠনের বস্ত্র মস্তকের কবরী ঢাকিয়া আছে মাত্র, সিঁথির উজ্জ্বল সিন্দুর রেখা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। একখানি হস্ত বক্ষের উপর ন্যস্ত, শ্বাসের উত্থান-পতনের সঙ্গে সেখানি দুলিতেছে! ললাটের স্বেদ বিন্দুগুলি ঝরিয়া ঝরিয়া নিমীলিত নেত্রের পালক গুলি আর্দ্র করিয়া দিয়াছে! নাসিকার ক্ষুদ্র ভূষণটীর হীরক খণ্ড দীপালোকে ঝলসিয়া উঠিয়াছে, তাতে ওষ্ঠাধর দুটী উজ্জ্বল লোহিতাভ দেখাইতেছে! ললিত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইযা একটু দেখিল। সকলটুকু হৃদয় দিয়াই বুঝিল, এ তরুণী সুন্দরী বটে! তার চেয়ে সুন্দর এর সেবাপরায়ণ প্রাণ! এই ত রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত আমার আহার আগুলিয়া রহিয়াছেন! আহা! এত সুন্দরের এত দুর্ভাগ্য! ললিতের চক্ষে জল আসিল। এতরাত্রি ঘুরিয়া তার ক্ষুধা লাগিয়াছিল প্রবল কিন্তু তা আর নাই! আহারে তার আর ইচ্ছা নাই। তবে কাকীমাকে ডাকিয়া জানাইয়া না দিয়ে গেলে ত হয় না। ডাকি বা কেমন করে; জাগিয়া বড় লজ্জা পাবেন না! ললিত ডাকিতে পারিল না একটা শব্দ করিল। মানদা চমক খাইয়া উঠিয়া বসিল! ঘুমের ঘোরে তখনও দেহের বসন সামলাইয়া লইতে পারে নাই। তেমনি ভাবেই বলিল, "কি জ্বালাতনই কর তুমি!" মানদা এই দু'চারি দিন ললিতের সঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, বেশী কথা বলে না।

মানদা ভাত বাড়িতে যাইতেছিল, ললিত বলিল, "না দরকার নেই, আমি খাব না।"

"খাবে না? কেন?"

"ক্ষিদে নাই।"

মানদা ললিতের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টিতে চাহিল। তার নয়ন যেন জ্বলিয়া উঠিল। তার দেহে কূলপ্লাবীযৌবন তরঙ্গ যেন ফুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া খেলিতে লাগিল। দীপ্ত দীপালোকে মানদার গৌর মুখমণ্ডল যেন একটা অগ্নি কুণ্ডের মতন ঝলসিয়া উঠিল! মানদা বলিল, "খাবে বই কি? আমি তবে এত রাত্রি বসে আছি কেন?"

ললিত কাতর হইল। বলিল, "আর কখনও এমন বসে থেকো না? খাবার সময়ের মধ্যে আমি যদি না আসি, তবে জান্‌বে আমি সে দিন আর খাব না। আমার জন্য এত কষ্ট কর্‌বার আবশ্যক নাই।"

"তোমার স্ত্রী থাক্‌লে, সে এত কষ্ট,—কি এর চেয়ে বেশীও কি কর্ত্ত না?"

"তা জানি না,—কিন্তু তুমি করো না।"

"আমার দুঃখে তোমার এত দয়া কবে হলো ললিত?"

মানদার মুখ আরও জ্বলিয়া উঠিল। ললিত কোন্‌ও উত্তর না করিয়া বাইরে যাইতেছিল। মানদা বলিল, "দাঁড়াও, যেও না। আমার এতটুকু কষ্টে, এতটুকু রাত্রি জাগরণে তোমার দয়া হইয়াছে ললিত? আশ্চর্য্য! আর আমার সারাজীবনের নিদ্রা থেকে তুমি বঞ্চিত কর নাই ললিত? আমার সংসার শয্যা তুমি কণ্টকময় করে দাও নাই? এই যে জীবন ভারটা আগুলিয়ে দীর্ঘ জীবন আমার

কণ্টক শয্যায় জাগতে হবে,—তার কারণ তুমি নও? আমি ছিলাম দরিদ্রের মেয়ে, ক্ষুদ্র আশা বুকে পুষে; সেই আশা যে আমার বেড়ে উঠে আকাশ ঢেকে ফেলেছিল, তার একমাত্র হেতু কি তুমি নও? তোমরা আবার নারীর দুঃখে সহানুভূতি কর? কি নির্লজ্জ!”

ললিত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল। মানদা আবার বলিল, “কাঁপছ কেন? ভয় নাই। মনে ভেব না, আমি এত অধম যে আমার নারী-ধর্ম্ম তোমার মত নির্ম্মমের পায়ে আছড়িয়ে চূর্ণ কর্‌বো। আজ দু’বৎসর বুকের মধ্যে অনেক সংগ্রাম করেছি, সে সংগ্রামে আমি জয়ীও হয়েছি! শোন আমার যা সঙ্কল্প! কাল থেকে দেখবে, প্রথম ধূম-কেতুর মত আমি তীব্রতেজে পৃথিবীতে বিচরণ কচ্ছি! সংসারের শান্তি নাশ করাই আমার ব্রত। আমার গুরু লঘু ভেদ নাই, শিশু বৃদ্ধ ভেদ নাই, দোষী নির্দ্দোষ ভেদ নাই। যাকে সম্মুখে পাব, তাকেই আমার বুকের আগুনে দগ্ধ করবো! তোমায় জানিয়ে, আমি কার্য্য ক্ষেত্রে নাম্‌বো, তাই এত দিন অপেক্ষা কচ্ছিলাম! এখন যাও।”

ললিত কয়েক পা চলিয়া আবার দাঁড়াইল। তার ইচ্ছা করিতেছিল মানদার পা ধরিয়া বলে,—এজন্য মানদা তাকে যতটা অপরাধী মনে করিতেছে, বাস্তবিক সে ততটা অপরাধী নয়। তার মনে হচ্ছিল, পূর্ব্বকার সকল ঘটনাই সে বিবৃত করিয়া বলে। কিন্তু তা বলিবার মত সাহস ললিতের টিকিল না। সে ধীরে, ধীরে, আপনার শয়ন ঘরে গিয়া, বুক জ্বলা ক্ষুধায় এক বিন্দু জলপানও না করিয়া শুইয়া পড়িল।

কিন্তু মানদা সেই রান্না ঘরে মাটীতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। “হায়! কেন আমি এতকাল যা বুকে পুষে রেখেছিলাম, তা এমন ভাবে তাকে বিলিয়ে দিলাম! আমার ত সংসারে যশঃ খ্যাতি সবই ছিল। আজ থেকে সকল রকম কলঙ্কের ডালি আমি মাথা পেতে নিলাম!”

সে রাত্রি আর মানদা তার শয্যায় গেল না। সেই রান্না ঘরে একাকিনী বসিয়াই কাঁদিয়া কাটিয়া মন স্থির করিয়া, সঙ্কল্প স্থির করিল! তার সঙ্কল্প হইল, সে দেখিবে পাপের তল কত দূর।

---

(৭)

পরদিন প্রত্যূষেই মানদা সনাতকে ডাকিয়া বলিল, "আমার এখনই কলিকাতার রেখে আস্‌তে হবে। এখনই।"

সনাতন বালিকার মুখশ্রী দেখিয়া চম্‌কিয়া গেল! এই ছুটো বছর সে মানদার মুখে শান্ত কোমলতা,—কণ্ঠস্বরে সহিষ্ণুতার মধুরতাই দেখিয়া আসিতেছে, আজ একি রুক্ষতা! ইনি যেন দীর্ঘকাল আহার নিদ্রায় অভাবে রোদে পোড়া লতাটীর মতন মুস্‌ড়ে গিয়াছেন! সনাতন যোড়করে বলিল, আমি বাবুকে খবর করি।"

"খবর আবার কি? বেয়াদব, আভি যানে হোগা।" মানদা ঘরের বাহির হইয়া আসিল। সনাতন কি করিবে কি বলিবে স্থির করিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি গিয়া রমাকে ডাকিল। রমা এসে বলিল, "একি! কাকী মা? কি হয়েছে?"

"তুমিত আমার মুনিব নও যে, তোমাকে আমার সব কথা বল্‌তে হবে।" মানদা ঘরের বাহির হইয়া গেট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। রমা বজ্রাহতার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল! সনাতন অগত্যা উড়ুনিটা কাঁধে ফেলিয়া মানদার অনুসরণ করিল।

রমা ললিতের ঘরে গিয়ে দেখিল, ললিত তখনও উঠে নাই, ঘুমাইয়াও নাই। রমা কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "কাকীমা এখনই চলে গেলেন কল্‌কাতায়—কাউকে কিছু না বলে।"

ললিত শয্যায় উঠিয়া বসিল! এ কি তারও যে মুখশ্রী প্রলয়ের আকাশের চেয়ে ভয়ঙ্কর! রমা সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারিল না। ললিত কোন কথাই বলিল না। রমা আবার বলিল, "তুমি একবার ছুটে যাও, ষ্টেশনের দিকে। তারা পায়ে হেটে গিয়েছে, পাল্কি ডাকিবারও সবুর সয় নাই।"

ললিত এবারও কথা বলিল না। যেন কিছুই সে শুনে নাই, কিছুই সে বোঝে নাই। রমা প্রলয় গণিল। রমা আবার বলিল, একটু উচ্চ কণ্ঠে—শুনলে সব, ঘুম ভাঙ্গেনি তোমার?

"হ্যাঁ শুনেছি!" বলিয়া ললিত রমার মুখ পানে চাহিল! কি অস্বাভাবিক সে দৃষ্টি। রমা বলিল, "এখন উপায়?"

"উপায় আর কি?"

'তুমি কাকীমাকে ফিরিয়ে আন।''

"নিষ্প্রয়োজন!"

"বলো কি! এমন ধারা কেন হলো, তুমি কিছু জান?"

ললিত কথা না বলিয়া বাহির হইয়া গেল! চলিতে যেন তার পা টলে যাচ্ছে। রমা ভাবিল, ললিত কাকীমাকে ফিরাইয়া আনিতেই গিয়াছে! কিছু সময় কাটিল, ললিত বা মানদা কেহই ফিরিল না। রমাব বসিয়া থাকিলে চলে না; নিমাই ও গৌরী খাবার চাহিল। রান্না ঘরে গিয়া দেখে, তৈরী অন্নব্যঞ্জন পড়ে আছে! মানদা বা ললিত রাত্রিতে কেউ খায় নাই। মানদা যেন সেই রান্না ঘরেই সারা রাত শুইয়াছিল। তার ঘর্ম্মাক্ত দেহের দাগ মেজেয় অঙ্কিত রহিয়াছে, রান্না ঘরের ভিজা মাটীর

উপর! অন্য পার্শ্বে ললিতের পায়ের চিহ্ন! অতি বড় একটা কুৎসিৎ কল্পনা রমার মনে আসিল! কিন্তু সেটা মনে করার চেয়ে, সমস্ত বিশ্বটা প্রলয়ে বিধ্বস্ত হইয়া যাওয়া মনে করা যে রামার পক্ষে সহজ! চট্ করে মনে আসিল, এই সকলই তার অপরাধ! সে কেন সবে নূতন বউটী বালিকা মানদার উপর, সংসারের সকল স্বাধীনতা ছাড়িয়া দিয়াছে! সে কেন মানদার সঙ্গছাড়া হইয়া, এমন আরামে গা ঢালিয়া দিয়াছিল! কি অনর্থ ই জানি ঘটিবে। রমার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। এতক্ষণ ভাবনার চাপে তার কান্নার অবকাশও আসে নাই!

রমা বাল-বিধবা! বৈধব্য ক্লেশ তার প্রাক্তন কর্ম্মের নিয়তি ভাবিয়া সে তার জন্য একটুও ভাবিয়া মন খারাপ করে না। স্বামীর ঘর হইতে তার কর্ত্তব্য উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া, তার সংসারে কর্ত্তব্য একবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া সে কখনও উদাসীন বা অলস নয়। তার একমাত্র দাদা ছাড়া আর কেউ নাই। দাদার বালক বয়সেই তাঁকে শোক-দুঃখ-দারিদ্রে অনেক আঘাত করিয়াছে, সেবা যত্ন উৎসাহের আশ্বাস দিয়া তাঁকে আনন্দ-সতেজ রাখা, রমা সংসারে একমাত্র কর্ত্তব্য মনে করিয়াছে! অন্য কর্ত্তব্য তার নারায়ণে ভক্তি, ঐকান্তিক নির্ভরে তাঁর আশীর্ব্বাদ—তাঁর প্রেম ভিক্ষা! তিনি পরকালের মুক্তি-বিধাতা, পতিত পীড়িতের আশ্রয়। তাই রমা এই নবীন বয়সে সার করিয়াছিল, ভাই-এর সেবা, আর ঠাকুরের নাম জপ! রমা ঠাকুরের মূর্ত্তি গড়িয়া লইয়াছে, তাহাতে মালা পরায়, ফুল চন্দনে পূজা করে, তার কাছে প্রাণের ভরসা জানাইয়া স্তুতি করে, ইহকালের কামনা তার ভ্রাতুষ্পুত্রীর মঙ্গল কামনা।

আজ রমা বড় আশঙ্কা, বড় ভয় পাইয়াই কাঁদিল! এমন কান্না আর সে কাঁদিয়াছিল সেই দিন সেই ১৭ বছর বয়সে—যেদিন তার

সংসারের বড় অবলম্বনটা—সে নিজেই মুখাগুন করিয়া ভস্ম করিয়া আসিয়াছিল! কিন্তু সে দুঃখেও তার এতটা দুশ্চিন্তা আসে নাই।

ললিত যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তার সঙ্গে মানদা বা সনাতন কেহ ছিল না। জন কয়েক মজুর সঙ্গে করিয়া সে আনিয়াছে। আনিয়াই সে তার ত্যক্ত বাড়ী খানির চালাঘর গুলি মেরামত করিতে লাগাইয়া দিল।

পাঁচ বছর আগে তাহারা কাকার সঙ্গে পৃথক অন্নে পৃথক বাড়ীতেই বাস করিত। অভাবে অনটনে কাকাই সাহায্য করিতেন। কাকার যখন সংসার ভাঙ্গিয়া গেল, তখন তাহার দুই সংসার নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া, দুই হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া এক হাড়ি করিয়া লওয়াই হইল। ললিতের তখন পঠদ্দশা! এল, এ পাশ করিয়া ললিত আর পড়িতে চাহিল না। নন্দকিশোর, নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিয়া তাহাকে বি, এ কলেজে ভর্ত্তি করাইলেন। ললিত কত বার ভাবিয়াছে, কাকাকে বলে, তাকে একটা কাজ কর্ম্মের যোগাড় করিয়া দিতে। কিন্তু তা হইলে, কাকার সংসার দেখিবার লোক থাকে না। আর চাকরী করাটা বড় একটা মনুষ্যত্বের নিদর্শন বলিয়াও ললিতের বিশ্বাস নাই। তার চেয়ে গ্রামে থাকিয়া, খাইয়া পরিয়া—যদি গ্রামের সেবা করা যায়, অশিক্ষিতের শিক্ষাবিধান, পীড়িতের চিকিৎসা, সমাজের সংস্কারে সহায়তা করা যায়, তাতেই বরং মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারে। ভরণ পোষণ কাকা দিতেছেন, ক্ষতি কি! তিনি ত আর পর নন। তাঁর ত আছেও বিস্তর। কাকার বিষয়ে প্রায় পনর হাজার টাকা আয়,—তাহা ত ত ললিতের স্বচ্ছন্দ স্বাধীন অধিকার। ললিত পুরাণ বাড়ীর ঘরদোর বেমেরামতীই রাখিয়াছিল। আজ তাহা

মেরামতের তার যেন খুব জরুরি গরজ আসিয়া পড়িয়াছে। রমা দেখিয়া ভাবিল, এ আবার কি? তবে ললিতের চোখ মুখের ভঙ্গি আর তেমন ভয়াবহ নয়। ললিত এখন ধুইয়া মুছিয়া ভাল মানুষটীই হইয়া আসিয়াছে।

আর ভাবিবার সময় নাই। রমাকে রান্নাবান্নার কাজে যাইতে হইল। ললিত কাল খায় নাই। গৌরী ও নিমাই সকালে ভাল ভাবে খায় নাই। তারাও ভাবনার মধ্যে পড়িয়াছে! গৌরীর বয়স ১১, নিমাই এর বয়স ৭, মোটামুটি তারা বুঝেছে, নতুন গিন্নী রাগ করিয়াই গিয়াছেন।

সেই দিনই বেলা তিনটার সময়ে মানদার ভাই দুলাল চাঁদ কাচা গলায় আসিয়া উপস্থিত। হাপির রোগী হরিনাথ হঠাৎ দম আট-কাইয়া মারা গিয়াছেন। দুলাল বোনের কাছে খবর দিতে আসি-য়াছে! ললিত দেখিয়া হাসিল। তার পর বলিল, "দুলাল মামা তোমার ভাগ্যি ভাল! এমন সুসময়ে কারু বাবা মরে না।"

"না ভাই, এয়াক্কি না। বাবা মরে যেয়ে আমলা ত একবালে অনাথ হয়েই পলেছি! এখন ভলসা এক জামাই বাবু।

"তা হবে, ভেবো না, পুরাণ বাবা গেছে, নতূন বাবা পাবে। কি বলো।"

"এ থাত্তার সময় নয়। মানদা কোথায়? তেলাত্তের শ্রাদ্ধটা তাল ত কত্তে হবে। আজ দু'দিন গেল।"

"তাই ত, তিনি যে কল্‌কাতায় গেছেন। তা হ'লে তোমায় কল্‌কাতায়ই যেতে হলো, এই সাতটার ট্রেণেই চলে যাও।"

সেইরূপই বন্দোবস্ত হইল! ললিত দুলালকে গাড়ী ভাড়া দিয়া-দিল, দুলাল কলিকাতায় গেল। দুলালের যে বাপ মারা গেছে,

সে জন্য সে মুখবলা গোছের দুটো সহানুভূতির কথাও বলিল না। দুলাল যে একবেলা হবিষ্য করিয়া আসিয়াছে, সাতটার আগে তাকে কিছু দুধ কলা খাইয়ে দেওয়া উচিত ছিল, ললিতের তা মনেই আসে নাই। মনের অবস্থার উপরই সব নির্ভর করে। দুলালের সঙ্গে ললিত যে কয়টী কথা বলিয়াছিল, তাও নিরিবিলি বসে নয়, তার ঘর মেরামতের কুলিদিগের কাজ কর্ম্ম দেখিতে দেখিতে, যেন নিতান্ত অমনোযোগে। তার মজুর খাটান যেন আজ বড় কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পরদিন সনাতন মানদাকে রাখিয়া বাড়ীতে আসিয়া দেখে, ললিত পুরাণ বাড়ী মেরামত করিতেছে। তাইত, ললিত কি তবে ব্যাপারটা সব বুঝিতে পারিয়াছে? ললিতের সঙ্গেই তবে নতুন গিন্নীর কিছু একটা হয়েছে নাকি! ললিত তেমন ছেলে কখনও নয়। সনাতন খুব ভাবনার মধ্যেই পড়িল। সনাতন বলিল, "হুঁ! ললিতবাবু, নতুন মার ভাই এসেছিলেন, কাচা গলায় পরে। তাকে একটু যত্ন আদর কর্ত্তে নাই?"

ললিত বলিল, "অযত্ন অনাদর ত কিছুই করা হয় নাই?"

"বাপ-মরা ছেলেকে একলাটী পাঠান হলো কল্‌কাতায়, কাজট ভাল হলো?"

"খুব ভাল হয় নাই।"

"তাকে কিছু খাইয়ে দাইয়ে দেওয়াও হয় নাই।"

"সেটা তখন তেমন মনে আসে নাই।"

"তুমি আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারলে।"

"কুড়ুল পায়ে লাগবার সময় হলে, শত সাবধানেও' তাও বাঁরণ হয় না।"

ললিত কলিকাতার খবর কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। রমা কিন্তু চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিল, সনাতন সব কথা গোছাইয়া বলিতে পারিল না। সে এই মাত্র

জানিয়া আসিয়াছে, নতুন মা এখন বাবুর কাছে কোনও কথা খুলে বলেন নাই। বাবু অনেক সাধ্য সাধনা করিতেছেন, তার মুখ দিয়া এখনও কোনও কথা স্পষ্ট বাহির হয় নাই। তবে দুলালকে যে অযত্ন করা হইয়াছে, তাতে বড়বাবু খুবই রাগ করিয়াছেন। তোমাদের খুব গালিমন্দই দিয়েছেন।

দু'চার দিন গেল, কলিকাতা হইতে কোনও খবরই আসিল না। রমা বলি "দাদা! পায়ে পড়ি তোমার! কাকা বাবুর সঙ্গে একবার দেখা ক'রো এসো।"

ললিত এক কথায় বলিল, "নিষ্প্রয়োজন।"

"বল কি? কাকা বাবু আমাদের বাবার চেয়ে বেশী না? কত স্নেহে আমাদের পালন করে আস্‌ছেন!"

"চিরকাল তার স্নেহ মমতায় আমাদের কি প্রয়োজন?"

রমা আর কথা বলিতে সাহস করিল না। কথা বলিতে গেলেই ভ্রাতার মুখশ্রী বড় ভীষণ হইয়া উঠে তার মনে যে অতি অপ্রিয় একটা চিন্তা মাঝে মাঝে তীব্র শূল বেদনার মত ঘা মারিয়া উঠিতেছিল, সেথা যেন আরও বাড়িয়া গেল।

নূতন শ্বশুরের শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিতে নন্দকিশোরের কিছু দিন কাটিল। সে গাঁয়ের লোকে বলিল, এমন যজ্ঞি এ গাঁয়ে শীগগীর কেউ দেখে নাই। হরিনাথ সার্থক বরকে মেয়ে দিয়া গিয়াছিল। মানদার রূপ-গুণেরই জয় জয়কার।

শাশুড়ী মাতঙ্গী বলিলেন, "বাবাজির আমার বড় বাড়াবাড়ি! এত খরচে কি দরকার ছিল? এক দায়ে ত দায় গেল না। দু'লালের ত একটা সংস্থান কত্তে হবে। আবার ওদিক ত এককুড়ি কুপুষ্যি শত্রু পুষ্‌ছেন!"

নন্দবাবু যে এতদিনেও কোনও খোঁজ খবর নিলেন না তাহাতে রমা ক্রমেই চঞ্চল হ'য়ে উঠিলো। ললিত বলিল, "ব্যস্ত কি? অমঙ্গল যত দেরীতে আসে ততই ভাল।"

দুলালের বাবার শ্রাদ্ধে ললিতের নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়াছিল; রমার অতি নির্ব্বন্ধেও ললিত গেল না। তার বাড়ীঘর তখন প্রায় সারা হইয়াছে! রমা কেবল নারায়ণকে ডাকে, "ও ঠাকুর! দয়া কর, রক্ষা কর।"

নন্দকিশোর একাকীই বাড়ী আসিলেন। আসিয়া ললিতকে আর রমাকে ডাকিলেন। ললিত আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। তার রুক্ষ মূর্ত্তিতে, রমার বুক কাঁপিতে লাগিল। নন্দকিশোর বলিলেন, "ললিত! ব্যাপারটা কি হয়েছে জান।"

ললিত বলিল, "আজ্ঞে জানি।"

"হ্যাঁ! তোমার কাকীমা তাইই বলেছেন। তিনি বলেছেন, ললিত কখনও মিথ্যা কথা বল্‌বে না। ঐ বালিকা প্রতি দিন রাত দুপুর পর্য্যন্ত একলাটি তোমাদের ভাত নিয়ে বসে থাক্‌তেন?"

"প্রতিদিন কি না জানি না, সে দিন ত ছিলেন।"

"তার কাছে দ্বিতীয় লোক কেউ ছিল না?"

"না?"

"তাঁর কষ্ট দেখে সেদিন তুমি ভাত খাও নি?

"না।"

"লোকটা সারাটা রাত্রি একলাটী রান্না ঘরে পড়ে কেঁদে কাটিয়েছে।"

"হতে পারে।"

"তোমরা কেউ তার খোঁজ নাও নি?"

"বোধ হয়, না।"

"নেওয়া উচিত ছিল ?"

"অবশ্য।"

"কুল বধূ, একলা বাড়ীর চাকরের সঙ্গে বার হয়ে গেল ? এটাও উচিত হয়েছে ?"

"আর ত যাবার কেউ ছিল না।"

"কেন তুমি ?"

"সোনাতন বাড়ীর বৃদ্ধ বিশ্বাসী চাকর, আমার চেয়ে সেই যোগ্য ব্যক্তি।"

"সঙ্গে যেতে না পার, তাঁকে নিবারণ কর্ত্তে ত পার্ত্তে।"

"অসম্ভব বলে বোধ হয়েছিল।"

"এমনি তিক্ত তোমরা তাকে করে দিয়েছ !"

"তাই বটে !"

"তুমি এসব জেনেও এব প্রতীকার কর নাই কেন ?"

"আমার অসাধ্য !"

"এর একমাত্র কারণ, আমি দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করেছি, কেমন তাই ত ? নতুন বউ এতুটো বছর ষোল আনা সংসারের ভার মাথায় নিয়ে চল্‌ছে,—তাতে কি হয় ;—তার বড় অপরাধ, সে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। কেমন নয় কি ?"

"অনেকটা সেই রূপই বটে।"

"দুলাল দ্বিতীয় পক্ষের কুটুম্ব, তাই তাকে তার বাবার শ্মশান থেকে আস্‌তে দেখেও একটু যত্ন কর্‌বার প্রয়োজন মনে কর নাই ?"

"তখন আমার মনের অবস্থা ভাল ছিল না।"

"থা'ক, এখন আমার কর্ত্তব্য কি ?"

"আপনি সপরিবারে কল্‌কাতাই বাস করুন।"

"কল্‌কাতায় ওঁর শরীর টেকে না। ওনি থাকৃতে রাজি হন না।"

"তবে বাড়ীতেই থাকুন। আমরা আমাদের বাড়ীতেই থাক্‌বো।"

"শুন্‌লাম, সে জন্য তুমি বাড়ী ঘর আগে থেকেই মেরামত করিয়েছ।"

"হ্যা, তা করেছি।"

"এঁরা একলাটী বাড়ীতে থাকেই বা কেমন করে, সহসা আমিও ত কল্‌কাতা ছেড়ে আস্‌তে পারি না।"

"কাকীমার মা ভাই এখানে আস্‌তে পারেন। ওঁর বাপ যখন মারা গেছেন, তখন আর সেখানে থেকেই বা কি লাভ?"

নন্দকিশোর যেন বড় আশ্বস্তই হইলেন। ললিত যে এমন ভাবে সরল কথায় তাঁর সঙ্কল্পটা তিনি প্রকাশিত করিবার আগেই সমর্থন করিয়া যাইবে, তা তিনি ভাবেন নাই। তিনি ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, এর জন্য তাঁকে অনেক কথা কাটাকাটি করিতে হইবে। অনেক অনুরোধ উপরোধ শুনিতে হইবে। দশ মিনিটের ভিতরই সকল বিষয় এমন স্বচ্ছন্দে মিটিয়া গেল দেখিয়া ললিতকে তিনি মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রকাশ্যে প্রশংসা করিয়াই বলিলেন, "ললিত, তোমায় আমি বুদ্ধিমান্ বলেই জান্‌লাম!"

রমা কাছে বসিয়া সব শুনিয়া যাইতেছিল। যখন কথার একরূপ শেষ হইয়া গেল, তখন সে, "জয় জগদীশ্বর" বলে যুক্ত কর ললাটে ঠেকাইল! আর যত অমঙ্গলই হউক না কেন তার দাদার চরিত্রে যে কালীর আঁচড়টীও লাগে নাই, যা সে নিভান্ত হীনচেতা বলে সেধে সেধে গুছিয়ে তুল্‌ছিল, তা যে সর্ব্বৈব মিথ্যা, এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি আছে? রমার কালো মুখ আলো হইল! সে বড় একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িল। নন্দকিশোর বলিলেন, "বাঁচলে রমা, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর তাবেদারী আর সইতে হলো না।"

রমা বড় ব্যথা পাওয়ার মতই কাতরে বলিল, "এমন কথা যদি

কেউ বলে থাকে, সে মিথ্যা বলেছে ! কাকীমার তাবেদারী ত কারও কর্ত্তে হয় না, কাকীমাই তাবেদারী করেন সকলের। অমন মেয়ের তাবেদারী করায়ও সুখ আছে। একদিনের অপরাধে কাকাবাবু এমন,—।”

ললিত ধমক দিয়া বলিল, “চুপ কর রমা, তুই কি জানিস্ আর কি বল্‌ছিস্।”

পরদিনই মানদা মা ভাইকে সঙ্গে নিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। রমা ও ললিত তাদের পুরাণ বাড়ীতে গেল। গৌরী বলে আমি দাদুর ঘরে থাক্‌বো,—নিমাই বলে আমি দিদিকে ছেড়ে যাব না ! এদের নিয়ে ব্যাপারটা একটু গোলযোগে পড়িল। নতুন শাশুড়ী মাতঙ্গী সকলেরই মরুব্বি। তিনি বলিলেন, “ওসব কি ! যার যার, তার তার যখন হলো, তখন আর ও অদল বদল কেন ? নিমাই থাক্‌বে তার মার কোলে, গৌরী থা’ক তার পিসিমার কোলে। মিছি মিছি একটা মিশেল ভাব আমি ভালবাসি না !”

রমা বলিল, “নিমাই মাটীতে পড়েই আমাকে চিনেছে, আমাকে ছেড়ে ও থাক্‌তে পারবে না। আর এটু বড় হলে যাবে। গৌরী ও আমার কাছে থাক ! নিমাইকে ছেড়ে আমারও বড় কষ্ট হবে।”

মাতঙ্গী সুর চড়াইয়া বলিলেন, “বড়ই ত দরদ দেখছি ভাই তোমার ! কেন ? ওসব আলুনি আদর কেন ? পয়সাওয়ালা মানুষের ছেলে কি না ? দেখতে দেখতে চুল পেকেছে, বুঝি, বুঝি, মানুষের পেটের খবর !”

দুদিন পরে নন্দবাবু বাড়ী থেকে যাবার সময়ে স্থির করিয়া গেলেন, তাঁর খামার জমি হ’তে পাঁচ বিঘা ধানী জমি, পূব পাশের ঐ দু’বিঘার পোড়ো জমিটা তিনি ললিতদের দিয়ে গেলেন। আর যেন তারা তাঁর কাছে কিছু আশা না করে।

মাতঙ্গী বলিল, "এর উপর আরও আশা! তা দেবে দাও, তোমার জমি জিরেট, তুমি দেবে? আমরা বল্‌তে কে?"

সে দিন নন্দবাবু যখন যাত্রার সাজ পরিতেছিলেন, তখন মানদা আসিয়া ধীরে ধীরে তাঁর কাছে দাঁড়াইল,—যেন তার খুব বড় একটা বল্‌বার আছে। নন্দকিশোর বলিলেন, "এখন যাচ্ছি, গাড়ীর সময় হলো।"

মানদা যেন স্বর্ণমৃগ দর্শনে সীতার অভিনয় করিতেছে,—খুব ভাল করিয়া তালিম করিয়া আসিয়াছিল। বলিল, "একটা কথা কি, আর এ কষ্ট করে বিদেশে থেকে, চাকরীর কি দরকার! যা আছে, ভাত কাপড়ের ত অভাব হবে না। একলা নিমাই ছাড়া আর দশটা নেই, ভাবনাই বা কি? আমি বলি, ও সব চাকরী বাক্‌রি ছেড়ে দিয়ে, এখন বাড়ীতে থেকে বিশ্রাম কর। চোখের উপর থাক্‌বে, সময় মত সেবা শুশ্রূষা কর্ত্তে পাব। তোমার কলকাতায়ও আবার মন টেকে না, আবার তোমায় চোকের বাহিরে দিয়েও স্বস্তি পাই না।"

কথাগুলি নন্দকিশোরের কাণে বীণার বাদ্য চেয়ে মিষ্ট লাগিল। এমন প্রাণমাখা আদরের কথা তিনিও আর কোনও দিন মানদার মুখে শুন্‌তে পান নাই। এ পর্য্যন্ত মানদা তার সাথে সেধে বড় কথাটিই বলে নাই, কথার উত্তর বই—একটী প্রশ্ন ও সে কোনও দিন করে নাই। সর্ব্বদাই যেন লজ্জা সঙ্কোচে জড়সড় থাকিত! আজ তরুণীর এ করুণ কণ্ঠ বড় মিষ্ট বাজিল! মানদা একটী পান তাঁর হাতে দিল! আর কয়টী পান সেজে কৌটা ভরে এনেছে, তার পথে যেতে সাথে নেবার জন্য। এও আজ নূতন। নন্দকিশোরের কাছে মানদা নিজে সাধিয়া বড় আসিত না। মানদা আজ স্বামীর

কাছে বেসিয়া, তাঁর কোটের বোতাম লাগাইয়া দিল। মাথার চুলটা ভাল করিয়া আচড়াইয়া তেড়ি কাটিয়া দিল,—আধ শিশি সুগন্ধি তেল ঢেলে সে কাচা-পাকা চুল গুলি ভিজাইয়া ফেলিল। নিজ হাতে রুমাল দিয়া মুখখানি মুছাইল। তারপর,—তারপর লজ্জাহীনা পঞ্চাশ বৎসরের স্বামীর সাথে বিশ বছরে প্রেমিকের ব্যবহার করিল! নন্দকিশোর অবশ হইলেন। তার দ্বিতীয় পক্ষে দারগ্রহণ সার্থক হইল। বিশ্ব তাঁর নিন্দা করুক, তিনি গ্রাহ্যই করেন না।

নন্দকিশোর চলিয়া গেলেন, না গেলে নয়। মানদা সেখানে দাড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিল, "জানিহে বৃদ্ধ, তুমি আমার দয়া করিয়াছ। নির্দ্দয় ললিত যখন যৌবন গর্ব্বে আমায় অবহেলা করিল, তখন তুমি নিতান্ত অনুকম্পায় আমার পিতার কন্যাদায় উদ্ধার করিলে। কিন্তু তোমার দয়া যে আমার সর্ব্বনাশের হেতু হয়েছে! আমি আর দু'বছর আইবুড় থাক্‌লে কি ক্ষতি হইত? তোমাদের সমাজের মাথায় বাজ পড়িত? তোমাদের শাস্ত্র ধর্ম্ম রসাতলে যাইত? তোমার উপর দয়া করা আমার উচিত বটে,—কিন্তু তা হ'লে আমার চলে না। আমার কাউকে বাদ দেওয়া চল্‌বে না। 'তুমি ত তুমি, ঐ যে তোমার ঐ অজ্ঞান শিশুটী, আমি ওর উপরও বিষ ঢাল্‌তে কসুর করবো না। গরল! গরল! সংসার গরলময় কত্তে এসেছি, গরলময় করেই যাব। তোমাদের লোকাচার শাস্ত্র সূত্র যদি রমণী হৃদয় এমন নির্দ্দয় ভাবে মন্থন না করিত, তবে এ গরল উঠিত না! নারীর হৃদয় সুধাময়—মন্থনেই গরল হয়।

নিমাই এর জ্বর হইয়াছে। সে বিছানা পড়িয়া বলিল, "বড় মাথা ধরেছে মা! উঃ! কি গরম! একটু হাওয়া কর না?"

মাতঙ্গী মানদা উভয়ই কাছে ছিল। মাতঙ্গী তার স্বভাব সিদ্ধ রুক্ষ কণ্ঠে বলিল, "হবে না জ্বর! কেবল রোদে ছুটোছুটি! দিনে একশ-বার রমার বাড়ী দৌড়!"

মানদার হাতখানা নিমাই এর গায়ে উঠিতে ছিল, মায়ের সাড়া পাইয়া যেন থামিয়া গেল। মা-মরা সতীনের ছেলেটার উপর তার সত্যিকার নারী হৃদয়টা যেন মাঝে মাঝে ফুটিয়া বাহির হইতে চায়, কিন্তু মন তাকে চেপে ধরে, তাকে জানিয়ে দেয়, ও যার ছেলে, সে তার জনমের খোয়ার করেছে! এতে সর্ব্বদাই সাহায্য করিত, তার মা মাতঙ্গী!

নিমাই এর মাথায় কেউ হাত দিল না। সে যাতনায় ছট্ ফট্ করিতে করিতে বলিল, "কাল মামা বাবু বড্ড মেরেছিল, তাই এত-বড় জ্বর হয়েছে! উঃ! জ্বলে গেল!"

মাতঙ্গী জ্বলে উঠে বলিলেন, "এই বুঝি আবার দুলালের মাথাটা খেতে বস্‌লে? ভাল বলছি নিমে, দুলালের নাম টাম করো না। দুলাল তোমায় মেরেছে? আর তুমি লক্ষী ছেলেটা।"

নিমাই কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল। বড় কষ্ট হইতেছিল তার! বড় কাতরে আস্তে আস্তে বলিল, "আমি একটু দিদির কাছে যাই।"

শুনিয়া মাতঙ্গী তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, "বটে ! এখন আদর কুড়ুতে যাবে ? ভাল কথা বল্‌ছি নিমে, আর যদি ও-বাড়ী পানে পা বাড়াবি, তবে ভাল হ'বে না বল্‌ছি।"

ন'বছরের ছেলে নিমাই আর চাপিয়া থাকিতে পারিল না। জ্বরে তাকে বড় জ্বালা দিতেছে। সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল ! তার কান্নার স্বর বাহিরে সনাতনের কাণে গেল। সনাতনের কাণ বোধহয় সে জন্য সর্ব্বদাই সতর্ক থাকে। সনাতন ছুটিয়া আসিয়া বলিল "কি হয়েছে নিমাই ?" সে নিমাইএর গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

মানদা বলিল, "সনাতন ! তুমি অমন যখন তখন অন্দরে ছুটে এসো, এ তোমার কেমন রীতি ?"

সনাতন বলিল, "কেন না ? আমি বাড়ীর চাকর, আমার ভিতরে আস্‌তে বাধা কি ?"

"না, ও-রকম কল্লে চল্‌বে না। থাক্‌বে ত চাকরের মতন থাক্‌বে, বেয়াদবি চল্‌বে না।"

সনাতন একটু বিস্মিত হইল। তার সাথে মানদার বচসা এই প্রথম ! এর আগে মানদা তার সঙ্গে ভালভাবে কথাই বলে নাই। ওদিকে বেশী মনোযোগ না দিয়ে, সনাতন নিমাইকে কোলে তুলে লইয়া বলিল, "বড় অসুখ করেছে দাদা ?"

"হ্যাঁ ! দাদা বড় জ্বর ! বড় জ্বলছে। তুমি আমায় একটু বাহিরে নিয়ে চল !"

"হ্যাঁ ! বাইরে নিয়ে চল,—বাহিরের হাওয়ায় জ্বর বাড়বে না ?" বলিয়া মাতঙ্গী সেখান থেকে চলিয়া গেলেন। নিমাইএর উপর সনাতনের অত আদর যেন তাঁর চোখে সইল না। নিমাই সনাতনের গলা জড়াইয়া ধরিল বলিল, "আমার দিদির কাছে দিয়ে এসো দাদা"

"না থাক্, এরা যে তাতে রাগ করেন।"

"তা করুন। এরা আমায মোটেই ভালবাসে না।'

"চুপ, চুপ, অমন কথা কি বলতে আছে!"

"না, আমি দিদির কাছে যাব। আজ বাবাকে বলবো, আমি এ বাড়ীতে থাকবোই না।" কান্নার আবেগে, জ্বরের যাতনায় নিমাই এর শ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছিল। সনাতন নিমাইকে কোলে লইয়া বাহিরে গেল। বাহিরে গিয়েই নিমাই খুব সুর করিয়া কাঁদিয়া ডাকিল, "ও দিদি! দিদিমণি! আমি মরি, আমায় নিয়ে যাও।" এতক্ষণে সে এমন করে কাঁদিতে সাহস পাইতেছিল না। রমার কাণে নিমাইএর কান্নার সুর পৌঁছিল। সে ছুটিয়া আসিয়া নিমাইকে কোলে লইল। গৌরীও তার সঙ্গে ছুটিয়া আসিয়া নিমাই এর গায়ে হাত দিয়া বলিল, "বড্ড জ্বর হয়েছে মণিকাকার! পিসিমা, নীয়ে চল আমাদের ঘরে।" রমা তাই করিল, কোনও মানা শুনিল না। নিমাইকে বুকে আঁক্ড়াইয়া আপনার ঘরেই নিয়ে গেল!

মানদা দুলালকে পাঠাইয়া ফটিককে ডাকিয়া আনিল। ফটিক এই গ্রামেরই একটী যুবক। নন্দবাবু বিষয়-কর্ম্ম দেখিতে একে গোমস্তা বা নায়েব নিযুক্ত করে গেছেন। ফটিক সুপুরুষ, অল্প বয়স্ক, লেখা পড়া ভালই জানে। এল,এ এক বছর পড়িয়াছে। প্রখর বুদ্ধিমান্, যাতে আজ কাল সংসারে পশার জম্মে, তেমন বুদ্ধি ফটিকের বিশেষ ভাবেই আয়ত্ত। ফটিক যে নন্দবাবুর আদায় তহবিলের ভার পাইয়াছে, তার প্রধান সার্টিফিকেট, ললিতের সঙ্গে তার আবাল্য বিরোধভাব, নন্দবাবুর বিবাহের সময়ে সে সেধেই গিয়াছিল বরযাত্র।

ফটিক আসিলে মানদা বলিল, "দেখ তোমাদের সঙ্গে এখন আবার কথা না বলিলে ত, চলে না।"

"তা চলবে কেন? আমরা হলাম চাকর বাকর!" বলিয়া মানদার মুখপানে তাকাইল। আর কোনও দিন সে মানদার আলগা মুখ দেখে নাই। দেখিল, আহা! এমন সুন্দর!

মানদা বলিল, "দেখ, এই নিমাইকে পোষা আমার অসাধ্যি! তোমাদের সকলেরই চেষ্টা আমায় কিসে বেইমান কত্তে পার।"

"সে কি? আপনার কথা শুনে বড় দুঃখিত হচ্ছি।"

"তুমি দুঃখিত হলেই ত আমার ব্যথা সারে না। শোন, জ্বরো ছেলেটা ছিল আমার কোলে, মাথা টিপছিলাম, বাতাস কচ্ছিলাম। সনাতন এসে তাকে কেড়ে নিয়ে দিয়ে এলো ও-বাড়ীতে। এদিকে ত তোমরা বলবে আমি সতীনের ছেলের আদর করি না।"

"বটে! সনাতনের এত ধাষ্টামি! আচ্ছা আমি ঠিক করে দিচ্ছি!"

"ঠিক আমিও যে কর্ত্তে না পারি, তা নয়। তবে কথাটা হচ্ছে কি, এ পুরীতে কেউ আমার আপনার বল্‌তে নাই।"

"বলেন কি? আর কারু কথা বলতে পারি না, আমি আপনার জন্য প্রাণ দিতে বলেন, প্রস্তুত আছি!"

ফটিক আরও কি বলিতে যাইতেছিল, মনের ভাবে কথা মিলাইতে পারিতেছিল না। মানদা তাকে বাধা দিয়া বলিল, "তুমি ত বেশ লেখা পড়া জান শুনেছি, আমাদের এ ছোট চাকরী কর্ত্তে এসেছ কেন?"

"দাদামশাই বড়ই ভালবাসেন। ছোট হলেও তার ভালবাসার গুণে এই আমার বড় চাকরী।'

"ও, তোমরা দাদা ভাইটী! তবে ত তুমি আমার ঠাকুরপো। সত্যি, এখানে এসে আমি কাউকে ঠাকুরপো ডাক্‌তে পারি নাই।

ও ডাকটা না ডাকতে পারলে, শ্বশুর বাড়ীর ষোলআনা সুখটার যেন কিছু বাকি প'ড়ে থাকে। কি বল, ঠাকুর পো!"

দুলালও ফটিকের সঙ্গে আসিয়াছিল। সে বলিল, "চল এখন ফতিক দা! আজ থিয়েতালের মিতিংতা কত্তেই হবে। একতা কিছু আমোদ প্রমোদ না থাকলে মানুষ কি বাঁচে! মানদা গোতা কয়েক "তাকা দিতে হবে কিন্তু।"

ফটিক হাসিয়াই বলিল, "তাইত, দুলাল বাবু যে থিয়েটার পাগল দেখছি। তুমি থিয়েটারে কি পাঠ বলতে?"

"আমি কি আর পাত বলি, আমি থাকি ম্যানেজাল্! মানদা, কিছু খেতে দিবি নাকি!"

মাতঙ্গী এক থালা লুচি বেগুন ভাজা আনিয়া দুলালের সম্মুখে রাখিলেন। মানদা বলিল, "ছি! ওকি! ঠাকুরপোকে দিলে না? মানদা উঠিয়া গিয়া আর একখানা থালা বেশ সাজাইয়া আনিয়া ফটিকেয় সম্মুখে রাখিল। বাক্সে সন্দেশ তোলা ছিল, তার ও দুটি আনিয়াছিল। দুলাল দেখে রাগিয়া বলিল, "বারে, আমি সন্দেশ পা'ব না মানদা, আমি কি এত পল হয়ে গেলাম নাকি,—আর ফতিক দা হলো—এত প্লানেল মানুষ!"

"দাদা আমার পরম পণ্ডিত আর কি?" বলিয়া—দুলালকেও দুটী সন্দেশ দিল।

জলপানি শেষ করিয়া পান মুখে দিয়া ফটিক উঠিয়া যাইতেছিল, মানদা ডাকিয়া ফিরাইয়া বলিল, "ঠাকুরপো! ললিত যে ডাক্তার খানা কচ্ছিল, তার কত দূর? আমি দশটী টাকা দেব বলেছিলাম, তা ত নিল না।"

"সে আমি জানি না বউদিদি! আমি ও-সবে নই।"

"তা জানি, ললিতের সাথে তোমার বনিবনাও নাই। আচ্ছা! ওর বোন রমা মেয়েটা কেমন মানুষ? খুব ত ঠাকুর পূজা করে।"

ফটিকের মুখে যেন কি একটা ছায়া পড়িল। যেন কি একটা যায়গায় তার ধাক্কা লাগিল। সে নিতান্ত অমনোযোগেই বলিল, "অত খবর আমি রাখি না,—আমি ওদের বাড়ীই যাই না।

"তা বেশ, ওরাও এ বাড়ী আসে না। ওরা এ বাড়ী ছেড়েছে, তাই ত তুমি এ বাড়ী ঢুকেছ।"

ফটিক দুলালের সাথে চলিয়া গেল। মানদার মনে একটা নূতন চিন্তার অঙ্কুর ফুটিয়া উঠিল! সে ভাবিল, সে যে একটা নরক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, তা ত নেহাৎ একলাটী চলে না। আর এই এত বড় দীর্ঘ নারী জীবনটা, একটা বৃদ্ধের সঙ্গে অভি-নয় করে কাটিয়ে দেওয়া ত নিতান্ত শয্যা-কণ্টকের মত বোধ হই-তেছে। পুরুষের গাঁথা সতীত্বের সূত্রে বাঁধা থাকিয়া জ্বালা পোহাইয়া দিন কাটাইতে গেলে, পুরুষেরই মর্য্যাদা বাড়াইয়া দেওয়া হয়। আমি ত পুরুষের পুররাজ্যে ধূমকেতু হইয়াই উড়িয়া যাইব সঙ্কল্প করিয়াছি। শাস্ত্র-সম্মত বিশুদ্ধ প্রাণ নিয়ে যখন স্বামীর সেবা কর্ত্তে নাই পারিলাম, তখন আর একটু নামিয়া যাইতে আপত্তি কি? এই ফটিকের সঙ্গে ললিতের বৈরিভাব, তবে ফটিকের সঙ্গে আবার বন্ধু ভাব হওয়াই সম্ভব। ফটিক চাহিয়াছিল ললিতের বোন রমাকে বিবাহ করিতে, ফটিক বংশে ছোট বলিয়া ওরা ফটিকের সাথে রমাকে বিবাহ দেয় নাই। তাইতে বোধ হয়, ফটিকের সঙ্গে ললিতের এমন বিরুদ্ধ ভাব।' বেশ স্বরূপ, সুন্দর চেহারা খানি,—মার্জ্জিত রুচি, আদব কায়দা মার্জ্জিত ধরণেরই। তবে ওর হৃদয়! হৃদয় দিয়ে আমি কি করিব? হৃদয় ত ললিতের ছিল,—সে দেশের লোক বাঁচাতে ডাক্তার খানা

করে, চাষাদের বিদ্বান কর্ত্তে স্কুল খোলে, কত লোকের রোগশয্যায় পাশে জাগিয়া রাত কাটাইয়া দেয়। আমার কি? আমি ত হৃদয়ের বিকিকিনি করিব না। ললিতের হৃদয় থাকিয়াও ত নিরপরাধে আমায় পদে দলিত করিল, তাইত দুঃখ!

সেই দিন হইতে ফটিকের সঙ্গে মানদার অবাধে দেখা সাক্ষাৎ চলিতে লাগিল। মানদা প্রথমে মনে করিল, ফটিকের সঙ্গে অবৈধ প্রণয় করিয়া ইন্দ্রিয় জ্বালার নিবৃত্তি করিবে এবং নন্দকিশোরের এত বড় বংশটায় ঘৃণিত কলঙ্ক লেপন করিয়া দিবে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল, সে কি, তাহা হইলে ত ফটিকের পুরুষ শক্তির কাছে তাহার নারী শক্তি খর্ব্ব হইয়া যায়! তাহা ত হইতেই পারে না। সে ত কোনও পুরুষ শক্তির কাছে তাহার নারী শক্তি খর্ব্ব পরাজিত হইতে দিবে না।

ফটিক তাহার কাছে আমার নারীত্ব ডালি চায়? কি স্পর্দ্ধা! এ স্পর্দ্ধার যোগ্যদণ্ড সে ফটিককে দিবেই! বাঘিনীর ছাগ শিশু লইয়া খেলার মতন এই হতভাগ্য ফটিককে নিয়া তাহার খেলিতে হইবে! নন্দকিশোরের সঙ্গে তাহার খেলা, ললিতের সঙ্গে তাহার খেলা, আর এই ফটিকের সঙ্গেও তাহার খেলা, এই তিন খেলাতেই দেখাইবে, তাহার নারীত্বের তেজ কত দূর!

মানদার চক্ষু রক্তবর্ণ, ললাট রেখাঙ্কিত, হইল, সে দন্তে অধর দংশন করিয়া মনে বলিল,—তাই, তাই হইবে, এই সঙ্কল্প।



দুলাল "নালাবোলা" কথা বলে বলিয়া যে একবারে ডান হাত বাঁ হাত না বোঝার মত মূর্খ, তা নয়। কয়টা বিষয়ে খাটি জ্ঞানই তার জন্মিয়াছে। তার সুন্দর গৌরকান্ত দেহখানিকে মানান মত জামা কাপড়ে সাজাইলে, তাকে যে কার্ত্তিকের মতন সুপুরুষ দেখায়, তাতে দু'লালের কোনও দিনই সন্দেহ আসে না। তার ভগিনী মানদাও অনুপম সুন্দরী; নন্দকিশোর বাবু কেবল টাকার বলেই বৃদ্ধ বয়সে মানদাকে বিবাহ করিয়াছেন। এটা তারও অন্যায়, দুলালের বাবারও নেহাৎ অন্যায়! সবার চেয়ে বেশি অন্যায় ললিতের,—সে অনেক অনুরোধেও মানদাকে বিবাহ করিতে রাজি হয় নাই,—তাকে তারা টাকা দিতে পারে নাই বলিয়া। আর ললিতের বোন রমাও খুব সুন্দরী, মানদার চেয়ে একটু বর্ণে ময়লা হইলেও তার অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের কোমলতা অধিক। ছেলে বয়সে রমাকে বিয়ে দিয়ে, এমন বিধবা করে তুলে রাখা নিতান্ত নিষ্ঠুরতার কর্ম্ম! পণ্ডিতেরা বিধবা বিবাহের শাস্ত্র দিয়াছেন, সুতরাং রমার বিধবা বিবাহ হওয়া নিশ্চয়ই উচিত। পাত্র কেউ না থাকে, দুলাল নিজে বিবাহ করিতে প্রস্তুত। এ জন্য আজ হিন্দু সমাজ তাকে রাখিতে না চায়, সে হিন্দুর খাতা থেকে নাম কাটিয়া, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম যা হয় একটা হ'তে রাজি আছে। রমার দুঃখে তার প্রাণ সত্যই কাঁদে।

দুলাল এতগুলি মনের কথা বলিবার মতন লোক পায় না। এ

বয়সে কথার ভার বয়ে বেড়ানও বড় দায়। বয়স তার এই সবে উনিশ ছাড়িয়ে বিশে পড়িয়াছে। প্রথমে সে সমবয়সী দেখিয়া ললিতের সঙ্গে মিশিতে গিয়াছিল, ললিত তার সঙ্গে মিশিল না, অবহেলায় সরাইয়া দিল। তারপর সে রমার কাছে বসিয়া সাধিয়া সাধিয়া কয়দিন রূপ কথা বলিল! সে রূপ কথা অনেক জানে। সে যে এবারে বর্ণ-হীন মূর্খ—তা মনে করা ভুল। আরব দেশের গল্প গুলির বাংলা তর্জ্জমা, আরও অনেক গুলি সস্তা নভেল বই সে পড়িয়া তার মেয়ে পুরুষের নাম গুলি মুখস্থ করিয়া, গল্প গুলি উদরস্থ করিয়া রাখিয়াছিল। রমা দু'চার দিন তাহার গল্প শুনিয়া আর শুনিতে চাইল না। তার পর দুলাল ফটিকের আশ্রয় নিল! ফটিক তার কদর বুঝিল। নন্দবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের শ্যালক, তাকে অবজ্ঞা অনাদর না করিয়া তাকে একটু প্রশ্রয় দিলে পরিণামে কিছু লাভই হইতে পারে—তা ফটিক অনায়াসেই বুঝিয়া লইল। এ রকম বুঝিতে ফটিকের বুদ্ধি গোড়া থেকেই খুব প্রখর।

ফটিক তাকে পাড়ার থিয়েটারের দলে ভিড়াইয়া দিল। থিয়েটার পার্টির ছোকরাও এমন রত্নের অনাদর করিল না। দুলাল পর দিনই পাঁচ টাকা চাঁদা দিল। আরও তারা দেখিল, দুলাল একটু নাচিতে পারে। বিশেষ দুলালকে চুল কাঁচলি দিয়া মেয়ে সাজাইলে হুবহু মেয়ে মানুষের মতন দেখায়, ঠিক যেন মানদারই বড় দিদি! গোঁপ দাড়ি তার মোটেই গজায় নাই।

দুলাল একদিন ফটিকের কাছে তার মনের কথা খুলিয়া বলিল। সে রমার রূপে পাগল হইয়াছে, রমার বৈধব্য-দুঃখে তার প্রাণ কাঁদিয়া আকুল হইয়া উঠিয়াছে। ফাগুনের আমের বোলের গন্ধ আর কোকিলের ডাকে চিরবিরহিণী রমার প্রাণে বাজের অধিক বাজে, তা

সে মানস নেত্রে স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। রমাতে তার মন মজিয়াছে। রমাকে যদি বিধবা বিবাহ করিতে পারে, তবে সে জীবন রাখিবে, নচেৎ বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনীর মত সে বিষ খাইয়া মরিবে।

ফটিক শুনিয়া ভাবিল, দুলালচাঁদ সমজদার বটে! রমার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ না হয়, এমন রক্তমাংস মানুষের থাকে না। কিন্তু ঐ দুলে গাধা কি রমার যোগ্য? সে যে নন্দনের পারিজাত, নরকের কুকুরের এ দুরাশা কেন?

ফটিক বলিল, "রমার কাছে একবার কথাটা পেড়ে ফেল না?"

দুলাল মুখখানা খুব বড় করে হেসে নিয়ে বলিল; "ভাই, লজ্জা কলে? গৌরী আল নিমাই সল্‌বদা কাছে থাকে, একতু নিলিবিলি পাই না।"

ফটিক সে দিন দুলালকে আধ গ্লাস সোডার সাথে সিকি গ্লাস ব্রাণ্ডি মিশাইয়া খাওয়াইয়া দিল। সে দিন শুভদিন ছিল, দুলালের হাতে খড়ি হইল।

রমা দিনের কাজ সারিয়া অপরাহ্নে স্নান করিতে গিয়াছিল, চারিপাশে ছায়া ঢাকা গ্রাম্য পুষ্করিণীর ঘাটে। আরও সেখানে গ্রামের অনেক মেয়েরা স্নান করিতে আসিয়াছিল। পুরুষেরা আর এক ঘাটে স্নান করে। দুলাল সেই ঘাটের ধারে একটা আম গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, রমা কেমন করিয়া স্নান করে, অঙ্গমার্জ্জনা করে। তখন আর সব মেয়েরা চলিয়া গিয়াছে। রমার আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল। দুলাল আজ শক্ত করিয়া মন বাঁধিয়া আসিয়াছে, রমাকে এই নির্জ্জন স্থানে মনের কথা বলিয়া ফেলিবে! যা থাকে কপালে! একবার আশার উৎসাহে সাহস পাইয়া দুলালের মুখ হাসিয়া

উঠিতেছিল আবার ব্যাকুব বেইমান হইবার ভয় আসিয়া তাকে কাঁপাইয়া দিতেছিল। সনাতনও আসতেছিল দিবসের কার্য্যান্তে গা হাত ধুইতে। দুলালকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "ও কি মামাবাবু ওখানে আড়ি পেতে কি হয়?"

এই যা মেরেছে! দুলালের বড় রাগ হইল। "পাজি! চোত লোক, গাধা, চাকল, পাতা, শূয়াল।" ইত্যাদি যতগুলি গালাগালি মনে আসিল, তাই বলে হাত পা খিচাইয়া সনাতনকে গালি পাড়িল। সনাতন বলিল "বারে! আমি তোমার কি আমি করেছি!"

ললিতও ব্যাপারটা দেখিয়াছিল! সে আসিল বলিল, "দেখ দুলাল-চাঁদ, আমি অনেকক্ষণ দেখছি, তুমি আড়ি পেতে মেয়েদের স্নানের ঘাটে দাঁড়িয়ে আছ। তুমি কি ভদ্র লোকের ছেলে? সাবধান, ফের অমন কল্লে, তোমার মুখে চূণকালী মেখে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেবো।"

দুলাল সবে এই সুরার আস্বাদ লইয়া আসিয়াছে! রাগটা বড় বাড়িয়া গেল। ললিতকেও যা না তাই বলে গালি দিল। এবং যাবার সময় বলে গেল, "আচ্ছা মজা দেখাচ্ছি! জান ত আমাল বোন যা বলবে, নন্দবাবু তাই শুন্‌বে। ভিতায় থাক্‌বে ভেবেছ! আচ্ছা দেখে নিও!

ঠিক সেই সময়ে নিমাই আর গোটা কয়েক পাড়ার ছেলে গান করিতে করিতে পুকুর পাড়ের বকুল তলায় আসিতেছিল। সে খানে ছিল তাদের হরিতলা। মাঝে মাঝে সেখানে এসে তারা হরির লুট দিত। তারা গাহিতেছিল—

নেচে আয়, নেচে আয় কানু নন্দদুলাল।

তুই না ধাইলে আগে ধায় না গোপাল ॥
তোমারে সাজাব মোরা রাখাল রাজা,
বনে ফুলের মালা গেথে করিব পূজা।
ক্ষিদে যদি পায়, ওগো ব্রজ রায়,
চাঁদ মুখে দিব তুলে পাকা বন ফল ॥

দুলাল যখন বড় বেগে বাড়ী ফিরিতেছিল, তখনই সম্মুখে পড়িল বালক কীর্ত্তনের দল! তাদের মধ্যে কেউ বলিল, চল "মামা হরির লুট দিতে।" দুলাল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গানের পদটা শুনিল! তার প্রখর বুদ্ধিতে গানের অর্থটা চট্ করিয়াই বুঝিয়া লইল। নন্দদুলাল! অর্থাৎ কি না নন্দবাবুর শ্যালা আমি দুলালচাঁদ; কিন্তু নন্দদুলাল বলিলে নন্দের ছেলে দুলালকেই বুঝায়। এ বদমায়েস বালকগুলি তবে তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া এই গানটা রচনা করিয়াছে। এরা কি রচনা করিতে পারিয়াছে, ঐ ললিতমোহন রচনা করিয়া দিয়াছে। কি মন্দ এরা! এতে তাহার গালাগালি, তাহার মা'র গালাগালি, নন্দবাবুর গালাগালি! দুলাল রাগে কাঁদিয়া ফেলিল। সেই রাগ-কান্না মুখেই বাড়ী ঢুকিল।

দুলাল চলে গেলে, সনাতন বলিল, "আজ দেখছি একটা কুরুক্ষেত্র হবে।"

"হ্যাঁ! আজ মাতঙ্গী দিদিমার মহিষ-মর্দ্দিনী পালার অভিনয় হবে।"

"হ্যাগা ললিতবাবু! একটা কথা শুন্‌লাম সত্যি না কি?"

"কি?"

"বাবু—না কি দুলালের সাথে গৌরীর বিয়ের কথা পেড়েছেন।"

"হ্যাঁ! তা যে অনেক দিন চল্‌ছে।"

"চমৎকার বটে।"

"দুনিয়ায় চন্দ্র সূর্য্য ওঠে আর নেমে যায়, ফুল ফোটে আর ঝরে যায়।—সবই চমৎকার! এ সৃষ্টিই চমৎকার।"

"তোমারই একটা ভুলে এই সর্ব্বনাশ!"

"তা হতে পারে।" ললিতের মুখ লাল হ'য়ে উঠিল! মনের কথা খুলে বলিলে কলঙ্ক মিথ্যা হইয়া যায়, অথচ খুলে বলা যায় না, সে যে কি কষ্ট, তা ভুক্তভোগীই জানে।

দুলাল কাঁদিতে কাঁদিতে আলু থালু বেশে মাতঙ্গী ও মানদার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। রাগে দুঃখে হাত খিচুনীতে তার মাথার তেড়ী পর্য্যন্ত—বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। মাতঙ্গী বলিলেন, "সাট! সাট্! কি হয়েছেরে খোকা।" দুলাল আরও খানিকটা কাঁদিয়া লইল, তার পর বলিল, "খানসামা সনাতন, আল গলীব ললিত আমায় বলো অপমান কলেছে। সুধু আমায় নয়, তোমাদেল সকলকে, জামাই বাবুকে'ও।"

মা ও মেয়ে দুজনেই ব্যাপার জানিতে উৎসুক হইলেন। মাতঙ্গী আঁচল দিয়ে দুলালের চোক মুখ মুছাইয়া দিলেন। দুলাল একটু সামলিয়ে নিয়ে, গোছাইয়া গাঁথিয়া জানাইল, ললিত তার মাথায় ঘোল ঢালিয়া তাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছে। সনাতন তাকে গাধা বলিয়াছে! আর ললিত একটা গান রচিয়া দিয়া ছেলেদের দিয়ে গাইয়ে বেড়াইতেছে, তাতে দুলালকে বলিয়াছে "নন্দদুলাল", অর্থাৎ তা হ'তে দুলাল নন্দ-বাবুর ছেলে, দুলালের মা,—যিনি হচ্ছেন শ্বাশুড়ী, মায়ের সমান, তিনি হলেন স্ত্রী! মানদাও তা হলে নন্দবাবুর মেয়ে। অর্থাৎ নন্দ-বাবু মেয়ের বয়সী বউ বিয়ে করে এখন একবারে বউএর গোলাম ভ্যা ভ্যা নন্দরাম হইয়া বসিয়াছে। এমন স্থানে তাদের থাকা কথনও উচিত নয়। তারা গরীব হ'লেও ভদ্রলোক। দুলাল যখন পুরুষ ছেলে, তখন তাকে দুটি ভাত সে যেমন করে হোক দিতে পারবে। আজই এখান থেকে চলিয়া যাইতে হইবে। ইত্যাদি।

নন্দবাবু বাড়ীতেই ছিলেন। কলিকাতার ব্যবসায় বাণিজ্য ছাড়িয়া দিয়া তিনি আজ ক'মাস বাড়ীতেই বাস করিতেছেন। দুলালের চেঁচা-মেচি শুনিয়া তিনি ভিতরেই চলিয়া গেলেন। গিয়া ব্যাপার সব শুনি-লেন। শুনিয়া আগে সনাতনকে ডাকিলেন। সনাতনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সনাতন, সত্যি কথা বলো। পুকুর ঘাটে দুলালকে ললিত খুব অপমান করেছে ?"

"অপমান আর বেশি কি ? ঘাটে মেয়েরা স্নান কচ্ছিলেন, দুলাল বাবু আমগাছের আড়ালে আড়ি পেতে বসেছিল, ললিতবাবু দেখ্‌তে পেয়ে তাড়া দিয়েছিলেন।"

দুলাল অমনি বলে উঠিল, "না জামাই বাবু, আমি তোমাল পা ছুয়ে বলতে পালি, তা না, আমি একতা পাখীল ছানা দেখ্‌ছিলাম।"

দুলাল এবারও খুব কাঁদিল।

নন্দকিশোর বলিলেন, "দুলালের নামে নাকি কি গান রচে গাওয়া হচ্ছিল !"

"ছেলেরা হরির লুট গাচ্ছিল। তাতে ছিল নন্দ-দুলাল একটা গানের কথা। দুলাল মামা তাতেই রেগে অস্থির !"

"কাজটা কি ভাল হয়েছে ?"

"আমি ত বিশেষ কিছু মন্দ দেখছি না।"

"তা দেখবে কেন ? দুলাল কুটুম্বের ছেলে জান ?"

"কুটুম্বের ছেলে বলেই ত রক্ষা, নইলে ঘরের ছেলে হ'লে ললিত বাবুর হাতে অত বেয়াদবি টিক্‌ত না।"

"বটে ! তোমরা সবায় মিলে আমার সোনার সংসারটা মাটী দিতে বসেছ।"

"তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি এমন ভাবে লোপ পেয়েছে !"

"কি বেয়াদবি! আচ্ছা সমাতন, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি কথা বলবে।"

"সনাতন কখনও মুনিবের সামনে মিথ্যা কথা বলে না।"

"তুমি নিমাইকে তার মার কোল থেকে নিয়ে রমার কাছে রেখে এসেছিলে? নিমাইকে শিখিয়েছ রমার কাছেই থাক্‌তে।"

"একথা সত্য।"

"কেন এমন কর?"

"নিমাইকে নতূন মার কাছে রাখতে আমার সাহস হয় না।"

"বটে, আমার চেয়ে তোমার দরদ বেশি?"

"তুমি নেশায় ডুবে আছ, আমি সত্য যা, তা বুঝতে পাচ্ছি।"

"এতবড় বেয়াদবি কোন মুনিবে ক্ষমা কর্ত্তে পারে?"

"আমি তোমার ত্রিশবছরের চাকর।"

"তাইত এত বেড়ে উঠেছ! চাকর বাকর পুরাণ হলেই মাথায় ওঠে। থাক, তোমার পাওনা গণ্ডা যদি কিছু থাকে, আজই বুঝে নাও, কাল সকালে তোমায় আমি এবাড়ী যেন দেখতে না পাই?"

"বল কি বাবু! সারা জীবন তোমার চাকর খেটে এ বুড়ো বয়সে আমি কোথায় যাব? আমার একটা কথা শোন। তুমি নতুন মাকে নিয়ে কলকাতায় গিয়ে থাক, আমরা বাড়ী থাকি!"

"এখনও মরুব্বিয়ানা করতে লাগলে? দূর হও আমার সুমুখ থেকে?"

সনাতন সরিয়া দাঁড়াইল। তার বৃদ্ধ দেহের শিথিল পেশীগুলি যেন ফুলিয়া উঠিল। ললাটে লোলচর্ম্ম কুঞ্চিত রেখাঙ্কিত দৃঢ় হইল। বক্ষ হইতে নিশ্বাস জোরে ছুটিল। সনাতন বলিল, "এমন করে তুমি নেশায় ডুবে গেছ! তুমি আমারও উপর বিশ্বাস রাখতে পাল্লে

না! একদিন ত এমন ছিল,—এই খানসামা সনাতন তোমার বুকের সুখ-দুঃখের কথা জান্‌তে পেত। তুমি ত কোলের দুধের বাটী আপনি না খেয়ে, সরিয়ে দিতে সনাতনের পাতে। তুমি নিমাইএর মার সঙ্গে কলহ করে সনাতনকে ডেকে নিতে তার মীমাংসা কর্ত্তে! তোমার মুখ দেখে সনাতন বুঝত—তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা, সনাতনের মুখ দেখে তুমি বুঝতে তার ক্ষুধা তৃষ্ণা! সে দিন তোমার একবারে চলে গেছে! বড় বড় একটা কাজে তুমি এই খানসামার কাছে পরামর্শ চেয়েছ! নইলে সাধে কি এতদিন তোমার গোলাম খেটেছি। আমার ত সংসারধর্ম্ম, গৃহকর্ম্ম, পুত্র পরিবার ছিল না। এমন হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খেটে টাকা রোজগার করবারও প্রয়োজন ছিল না! এখানে বাপের আদর মায়ের ভালবাসা পেয়েছিলাম,—সংসারে কেউ ছিল না,—এখানে আপন জন পেয়েছিলাম, তাই, তাই, নইলে টাকার জন্য এ ত্রিশ বছর তোমার গোলামি খাটি নাই! আজ তুমি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ? আমি যাব কেমন করে? তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ, কিন্তু তোমার ঘরগুলি যে আমায় বুকে আঁক্‌ড়ে রাখতে চাচ্ছে! ঐ যে গাছ পালা গুলি মাথা নেড়ে আমায় বারণ কচ্ছে! স্বর্গ থেকে নিমাইএর মা যেন আমায় বল্‌ছে, 'যাস্‌নে সনাতন, আমার নিমাইকে ফেলে!' বাবু! নিমাই তোমার লক্ষ্মীর সোণার কৌটা! বুঝতে পাচ্ছ না তার অবস্থা! না বাবু, আমি যাব না, আমায় তাড়িয়ে দিয়ে না,—আমি ছাড়া তোমার আর কেউ নাই। তুমি কাল সাপ ঘরে পুষেছ।"

সনাতন বালকের মত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মাতঙ্গী ও মানদা এর আগেই সেখানে আসিয়াছিলেন। মাতঙ্গী বলিলেন "না বাপু, তুমি যাবে কেন? পুরাণ চাকর, ধর্ম্মপুত্তুর। আমরাই চলে যাচ্ছি।

আমরা কাল সাপ! বাবা, চাকরের এমন মুখ! আমার হলে, আমি ঝাঁটা বিধিয়ে দিতুম।"

মানদাও বলিল, "শুন্‌লে বেটার কথার ছিরি? আমি কাল সাপ? এত অপমান চাকরের মুখে। ব্যাটা মায়া কান্না কেঁদে ভুলোতে আস্‌ছে! সনাতন এবাড়ী থাক্‌লে আমি গলায় দড়ি দেব। আমি যেন কিছু বলি না, ঐ ব্যাটাই ত নিমে ছোড়ার মাথা খেয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টাই শিখাছে ও সৎমা, শত্রু, ওর কাছে যেও না, ওর হাতে খেও না? নইলে ছেলে কি আমার অমন করে বিগড়ে যায়? চল মা, আমরা আমাদের কুড়ে ঘরেই যাই, এ কোঠা বাড়ীতে থেকে আর কাজ নাই। এখানে সাধের চাকর সনাতন থাক। ব্যাটা মুখের উপর এমনি বকে গেল, তার একটা জবাব ওঁর মুখ দিয়ে বেরুলো?

মানদা রাগে কাঁদিয়া ফেলিল।

নন্দবাবু প্রাণে একটা উল্টা বাতাস যেন বয়ে যাচ্ছিল! শাশুড়ী ও গৃহিনীর বাক্যে সেটা সরিয়া গেল। তিনি চোখমুখ যতটা পারেন গরম করিয়াই বলিলেন, "বের হও, হারামজাদ উড়ে! এই জুতো দেখছিস!"

সনাতন বৃদ্ধ, এত বড় শাসনটাও সহিয়া নিতে পারিল। সেখান হইতে আস্তে আস্তে সরিয়া গেল।

মাতঙ্গী তখন বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—ঐ বেটাই ত সকল নাট্‌কুটির গুরু। আমার দুলালকে ত ও চোখে দেখতেই পারে না। ব্যটা চোর, আস্ত ডাকাত, এক পয়সার পান আনতে দিলে আধ পয়সা চুরি করে। তোমরা ত দেখ না, আমি বেশ বুঝে নিয়েছি! টাকা হলে চাকরের অভাব কি? ঐ সনাতনই ত ললিতকে বারণ করে, দুলালের সাথে তার ভাই-ঝিটার বিয়ে দিতে! নইলে কি ললিত দেয় না! হ্যাঁ বাবা, নন্দকিশোর!

আমার দুলালের একটা সংস্থান তুমি করে না দিলে আর কে করে দেবে বল? ঐ ত শুন্‌লে তার নামে কি কলঙ্ক তুলেছে। বয়সের ছেলে, অমন উড়োছুটো থাক্‌লে কত কথাই লোকে বল্‌বে। আমার দুলাল কিন্তু তেমন নয়।"

তখন ফটিক ললিতকে ডাকিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল। মানদা সে খান থেকে সরিয়া গেল। নন্দবাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "দেখ ললিত! তোমরা সকলই আমার পিছে এমন করে লেগেছ কেন? সব ছেড়ে—এ বয়সে একটু নিরিবিলি থাকতে চাই, তোমাদের তাতে কি অনিষ্ট?"

ললিত নত মস্তকে বলিল, "আমি আপনার কথা ভাল করে বুঝতে পারি নাই।"

এই কথাটুকুর বাতাসেই নন্দবাবুকে গরম হওয়ার সুবিধা করিয়া দিল। বেশ ধমক দিয়েই বলিলেন, "অত ন্যাকা হলে চলে না। দুলালকে আজ পুকুর ঘাটে খুব অপমান করেছ?"

"হঁ্যা! তবে যতটা করা উচিত, তা করা হয় নাই।"

"তাকে ধরে মার নাই? দুলাল আমার বাড়ীতে থাকে, আমার আত্মীয় না হোক, আমারই পরিবারের একজন লোক, ওকে অপমান করলে আমার অপমান করা হয় তা জান?"

"আগে জান্‌তাম না, এখন বুঝলাম।" ললিত হাসিল। নন্দবাবু বৃদ্ধ হইলেও তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ! ললিতের হাসিটুকু প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল! বলিলেন, "আমি এখন তোমাদের তামাসার মানুষ হয়েছি।"

ললিত কথা বলিল না।

নন্দবাবু বলিলেন, "আমার অপরাধ আমি দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছি। কেন করেছি তাত জানই। আগে ভাবতাম, কাজটা ভাল

কল্লাম না, এখন দেখছি, এমন না কল্লে যে এ বয়সে পথে পড়ে মর্ত্তে হতো। কে বা দুটো খেতে দিত? কেই বা মরতে পড়লে মুখে একটু জল দিত। ছেলেটাকে নয় বিলিয়ে দেওয়া চলতো, নিজেকে বিলিয়ে দিলে ত কেউ নিতো না।"

ললিত এবারও কথা বলা প্রয়োজন মনে করিল না। নন্দবাবু একটু কাসিয়া দু'চারিবার গড়গড়ার নলটা জোরে টানিয়া আবার বলিলেন, "যা'ক তোমাকে যে জন্য ডেকেছি। গৌরীর বিয়ের কোনও ঠিক কত্তে পাল্লে কি?'

"না, পারি নাই কিছু।"

"পারবে কি? মেয়ের বিয়ে ত আর এমনি হয় না? দুটো পয়সা রোজগার করবার চেষ্টা ত তোমার একবারেই নাই। এতবড় একটা কন্যাদায় তোমার ঘাড়ে, তুমি চুপ করে রয়েছ!"

"আমি টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেব না। টাকা আমার নাই, থাকলেও দিতাম না। টাকা দিয়ে মেয়েকে বর কিনে দেওয়ায় মেয়ের উপর স্নেহ দেখান হয় না, বরং তাকে অপমান অনাদর করাই হয়! এই যে টাকা দিয়ে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার প্রথা, এটাকেও আমি বর্ত্তমান যুগের একটা বিলাসিতা বলে মনে করি।"

"টাকা নইলে মেয়ের বিয়ে হবে?"

"নিশ্চয়ই, ছেলেদেরও ত বিয়ে করবার গরজ আছে।"

"তা বেশ বুঝেছ, তোমার ভাই-ঝি সুন্দরী মেয়ে, কত এম এ, বি এ ছুটে আসবে।"

"এম এ, বি এ হলেই যে সুপাত্র হলো, তা আমি আর বিশ্বাস করি না।"

"তা বটে! এই কথাটা ঠিক বলেছ। তবে আমি বলি কি, দুলালকেই দিয়ে দাও গৌরীকে। মা-বাবা-হারা মেয়ে, নিজেদের কাছেই থাকবে।"

"এ কথার উত্তর ত আমি দিয়েই রেখেছি, আবার কেন ?"

"দেখ, গৌরীকে আমার চেয়ে তোমরা কেউ বেশী ভালবাস না।"

"তাই ত জান্‌তাম।"

"এখনও জেন। গৌরীর সুখের দিকে আমায় একটু চাতেই হবে। তোমায় ত দিয়েছি, ঐ ক'বিঘা জমি। নইলে বাবা বুঝতে, ব'সে ব'সে খাওয়া আর—গ্রামের পাবলিক কাজ করা। গৌরীকেও আমার কিছু দিতে হবে। আবার দুলালকে যখন ঘাড়ে করেছি, তখন ওরও একটা কিছু উপায় করে দেওয়া দরকার! আমারই বা কি এমন আছে ? আমি ভাবছি, গৌরী আর দুলালকে এক সঙ্গে গেঁথে দিয়ে, কিছু জমি জমা তাদের করে দেই। অন্ন বস্ত্রের কষ্ট না পেলেই হলো।"

ললিত এবার একটু আগাইয়া বসিল, তারপর বলিল, "দেখুন, কাকা মশাই, আপনার সঙ্কল্প সাধু, তার সন্দেহ নাই। গৌরীকে দুলালের সঙ্গে বিয়ে দিলে, অন্ন বস্ত্রের অভাব না হতে পারে, তাও বিশ্বাস করি। কিন্তু মানুষের অন্ন বস্ত্র ছাড়া আর একটা বড় জিনিষ আছে। দুলালের ঘরে তা কখনও আস্‌তে পারে না। গৌরী আমার দাদার একমাত্র স্মৃতি-চিহ্ন, আমি গৌরীকে হৃদয় দিয়ে পালন করেছি, মানুষের হৃদয়ের শোভা দিয়ে আমি গৌরীকে সাজিয়েছি। গৌরী আমার সারা জীবনের গাঁথা রত্নহার, দুলাল তার যোগ্য হতে পারে না। আপনি এ বিষয়টায় আর অগ্রসর হবেন না।"

নন্দকিশোর কতক্ষণ চুপ করিয়াই রহিলেন। তারপর বলিলেন, "যা'ক, মনে কর আমার শ্যালার বিয়ের জন্য আমারই খুব দরকার। আমি তোমায় আরও পাঁচ বিঘা জমি, আর পাঁচ শ'ত টাকা নগদ দিচ্ছি! গৌরীকে দুলালের সাথে বিয়ে দিতে হবেই।"

ললিত বসিয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। সহসা সে ঘরে একটা বজ্র

পাত হইলেও বোধ হয় ললিত এত চম্‌কে যাইত না! "কাকামশাই বলেন কি? শেষ কালে আমায় কন্যাবিক্রয়ে উৎসাহিত কচ্ছেন? কি অভিশাপ এসে পড়লো এ বংশের উপর?" ললিতের প্রতি অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল! এ যে বংশনাশেরই সূত্রপাত! নীরবে ললিত চলিয়া যাইতেছিল। নন্দকিশোর ডাকিয়া বলিলেন, "কেমন? এতে সম্মত আছ?"

ললিত গর্জ্জিয়া উঠিল, "কাকামশাই! তুমিত আমার সে কাকা আর নাই। যতক্ষণ পেরেছি, তোমার অনেক দুর্ব্বলতা, অনেক নিন্দা গ্লানি আমি বুক পেতে নিয়েছি, আমি তোমার অন্নে বর্দ্ধিত, তোমার স্নেহে প্রতিপালিত, তোমার জন্য হৃৎপিণ্ড ছিড়ে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। আজ কি বল্‌ছ তুমি? তোমার কুলে কি এমন কুসন্তান জন্মেছে, যে টাকার লোভে, জমিদারীর লোভে কন্যা অপাত্রে দান করবে, কন্যা বিক্রয় করে ধনী হ'তে যাবে। কাকাবাবু, বুঝলাম এ বংশ আর থাকে না! নিতান্ত অভিশাপ, নিতান্ত কোনও ঋষির বা সতীর অভিশাপ এর উপুর পড়েছে! নইলে গৌরীর "দাদু" বল্‌তে পারেন গৌরীকে বিক্রয় করে টাকা নিতে!"

ললিত কম্পিত পদে বাহির হইয়া গেল! তখন রাত্রি হয়েছে, সন্ধ্যার যতক্ষণ অন্ধকার ছিল, তা কেটে গিয়ে, চাঁদ উঠেছে! ললিত দরজা ছেড়ে চলে যাইতে দেখিল, সনাতন তার তুলসি-মঞ্চে মাথা কুটিতেছে। ললিত বলিল, "একি সনাতন দাদা! এত রাত্রে তোমার পূজা আহ্নিক সারা হয় নি?"

সনাতন উঠিয়া দাঁড়াইল। তার চোখ ছুটে বুক বয়ে ধারা পড়িতেছে। সনাতন বলিল, "এ তুলসী মঞ্চে, আমার এই শেষ পূজা।"

"কেন? সে কি?"

"আমার জবাব হয়েছে!"

"তা বুঝতে পেরেছি, তা বুঝতে পেরেছি, লক্ষ্মীর জবাব এ সংসারে অনেক দিন হয়ে গেছে।"

"নিমাইকে দেখিস্ ললিত, আমার নিমাইকে দেখিস্।"

"যে চিতাশয্যায় শুয়ে, তার আর দেখবার কি আছে? সনাতন দাদা, চলে যাও তুমি।"

ললিত আর দাঁড়াইল না। সনাতন চলে যাচ্ছে শুনে তার প্রাণে একটুও ব্যথা বোধ হইল না।

সনাতন ভাবিয়াছিল, সে যাইতে লাগিলে অন্ততঃ ললিত তাকে আশ্রয় দিয়ে রাখিবে। ললিত তা করিল না দেখিয়া, সনাতন ভাবিল, এ সংসারে সত্যই তার কেউ নাই। ললিতের উপর তার, একটা বিষয় মনে হইলে বড় রাগ হইত। ললিত যদি মানদাকে বিবাহ করিত, তা হইলে এমন হইত না। ললিতকে সে কতবার এ কথা বলিয়াছে। চাষা মানুষে মনের কথা গোপন রাখিতে পারে না। ললিত তার কোনও সদুত্তরই দেয় নাই। আজ সে কথাটা সনাতনের বার বার, খুব বড় করেই মনে আসিতে লাগিল। ললিত কি এই বংশটা এমনি করে নাশ করিবে বলেই এমনি গুরুজনের অবাধ্য হইয়াছিল; থা'ক, এ সবে আর ফল কি। যখন যাইতেই হইল, তখন আর বিলম্ব করিয়া ফল কি? খুব প্রত্যূষেই সে রমাকে গিয়া শয্যা থেকে ডাকিয়া উঠাইল। রমা সকল ব্যাপার আগে থেকেই শুনিয়াছে, বিশেষ বিস্মিত হইল না। সনাতন একটা থলে রমার হাতে দিয়ে বলিল, "দিদি, এ গুলি তুই রেখে দে। পথে কোথায় ডাকাতে কেড়ে নেবে। তারপর একটা আস্তানা ঠিক করে এসে, আমি আমি নিয়ে যাব। আর যদি নাই বা আসি, তবে গৌরী নিমাইকে ভাগ করে দিস্।' আর কিছু দিয়ে তুই একটা পাথরের ঠাকুর গড়িয়ে নিস্।"

রমাকে কথাটী বলিবার অবকাশ না দিয়াই, থলেটা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া সনাতন যাইতেছিল। পেছন থেকে গৌরী আসিয়া বলিল, "কোথা যাবে জ্যাঠামশাই?"

সনাতন মুখ বাঁকা করিয়াই বলিল, "যাঃ, পা বাড়াতেই বাধা দিল। যাচ্ছি যমের বাড়ী।"

গৌরী দেখিল, সনাতনের চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছে। তারও কান্না আসিল, সে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, 'না জ্যাঠা! তুমি যাবে না। তুমি কি আমাদের ছেড়ে যেতে পারবে? আমি নিমাইকে ডেকে দিচ্ছি!" বলিয়া গৌরী নিমাইকে ডাকিতে গেল। নিমাই বাড়ীতেই শুইয়াছিল, রমার কাছে আর আসিতে পায় না।

সনাতন কাপড় চোপড় ক'খানা আর জপের মালার থলিয়াটা লইয়া, "জয় মা" বলিয়া প্রস্থান করিল। দরজার বাহিরে গিয়া, একটু দাঁড়াইল! সে ত ঠিক করিয়া বাহির হয় নাই, কোন্ পথে যাইবে? পিছন হইতে নিমাই আসিয়া ডাকিল, "সনাতন দাদা! তুমি কি সত্যই চলে যাচ্ছ?"

সনাতন না ফিরিয়াই উত্তর করিল, "হুঁ!"

"ইস্? যেতে আর হয় না।"

"তোমার বাবা আমায় জবাব দিয়েছেন।"

সনাতনের গলাধরা। মুখ আকাশ পানে।

নিমাই বলিল, "আমি তবে কার কাছে থাক্‌ব?"

"তোমার মা বাপ আছেন।"

"না, সনাতন দাদা, তুমি চলে গেলে আমি মরে যাব।"

"তার আমি কি করবো?"

"আমার উপর তোমার একটুও ভালবাসা নাই?"

"তা নাই, চাকরের আবার ভালবাসা?"

"তা যাও, ফিরে এসে শুন্‌বে যে, তোমার নিমাই মরে গেছে।"

"কি জ্বালা! চোখের জল যে রাখ্‌তে পারি না। নিমাই, দাদা,

আমার!" সনাতন পিছন ফিরিয়াই নিমাইকে কোলে তুলিয়া জড়াইয়া ধরিল। বন্যার মত তার চোখ দিয়া জল ছুটিল। নিমাইএর অশ্রু-ভেজা মুখখানি ঘন ঘন চুম্বন করিয়া বলিল, "নিমাই! তুই আমার কে?"

নিমাই কান্নায় ফুলিয়া বলিল, "দাদা! আমি তোমার?"

"তুই ত আমার! আমি তোর হ'তে পারি কই?"

পেছনে মানদা এসে রুক্ষ স্বরে বলিল, "নিমে; বড় যে আদর কুড়ুতে এসেছিস্?"

সনাতন নিমাইকে কোলে করিয়াই বলিল, "মা! তুমি ত মায়ের জা'ত, তুমিত বুকের ব্যথা বোঝ! এমন সাপের মত বিষ ঢাল্গা জিব কেন হলো তোমার?"

মানদাও উত্তর করিল, "সে কথা জিজ্ঞেস করগে যা তোর বড় বন্ধু ললিতের কাছে।"

পেছনে নন্দকিশোর আসিতেছেন দেখিয়া মানদা আরও কি বলিতে যাইয়া, থামিয়া মাথায় ঘোমটা দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল! নন্দকিশোর অতি তিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, "সনাতন, মতলবটা এখনও ছাড়্তে পারে নাই? আমার নির্ব্বংশ করাই তোমাদের ইচ্ছা!" বলিয়া নিমাইকে ছিনাইয়া সনাতনের কোল হইতে নামাইয়া লইলেন।

সনাতন ধপাস্ করে বাবুর পায়ের উপর বসিয়া পড়িল, তার পর পাদুখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবু! আমায় মাপ কর। আমি যেতে পার্ব না। আমায় থাক্তেই হবে। আমায় রাখ্তেই হবে তোমায়। আমি মাইনে গণ্ডা চাই না,—খেতে না দাও, অপর বাড়ী জন খেটে খাব। আমায় তোমার উঠানে একটু পড়ে থাকার যায়গা দাও। তুমি আমায় লাথি জুতা মেরো, নতুন মা আমায় দিনে দুবার ঝাঁটা মারবে, আইমা পোড়া লোহার শলা বিঁধিয়ে দেবে, তবু আমি

থাক্‌বো তোমার উঠানে পড়ে! আমার অপর যায়গা নাই।"

নন্দবাবু সনাতনের চোখের জলে ধোয়া পাখানা সজোরে ছাড়াইয়া লইয়া নিমাইএর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে চলিয়া গেলেন।

সনাতন আর বিলম্ব করিল না। একেবারে ছুট্ দিল,—তার জপের মালা আর কাপড়ের পুটলি সেইখানেই পড়িয়া রহিল! সনাতন দৌড়াইল!

অনেক পথ দৌড়াইয়া একটা গাছের শিকড়ে বাধিয়া পড়িয়া গিয়া অজ্ঞান হইল। তখন সূর্য্য উঠিয়াছে! চাষারা—"নাস্তার" বাসন গামছায় বাঁধিয়া গরু তাড়াইয়া মাঠে যাইতেছে। সনাতনকে রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, সকলে সে জন্ম ব্যস্ত হইল। এ গাঁয়ের সকলেই সনাতনকে চিনিত! একে একে সেখানে অনেক লোক জড় হইল! কেহ সনাতনের শুশ্রূষা করিতে লাগিল, কেহ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। সকলেই সনাতনের এ অবস্থায় কারণ অনুমান করিতে লাগিল। সবারই একরূপ অনুমান। বড় মানুষের বাড়ী, তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সংসার, কিন্তু সনাতন একে বুড়ো, আর বড় ভাল মানুষ! এর উপর একি অত্যাচার?

তখনই একজন সন্ন্যাসী সেই ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করিয়া সনাতনকে ডাকিয়া তুলিলেন। সনাতন যেন ঘুমাইয়াছিল, সন্ন্যাসীর ডাকে জাগিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "বল্ ভাই! তুই ও পাগল আমিও পাগল, তোর সঙ্গে আমার দোস্তি!"

সনাতন দেখিল ভোলানাথ গোঁসাই! দুর্ব্বল কণ্ঠে বলিল, "তুমি আমায় ভুলে যাও নাই ঠাকুর?"

"দুনিয়ার জল বাতাস, চন্দ্র সূর্য্য, আকাশ মাটী কেউ তোমায় ভোলে নাই, আমি ভুলব কেন?" ভোলানাথ সনাতনকে লইয়া নদীর দিকে, যেখানে বড় জঙ্গল, সেই পথে চলিয়া গেলেন।

সেই দিন বেলা দশটা বাজিবার আগেই দেখা গেল, দুলাল চাঁদ জন কতক মজুর নিয়া ললিতের ক্ষেত খোলায় ঢুকিল। সে হইতেছে, নন্দকিশোরের দেওয়া ললিতের সেই দু'বিঘা জমি, ললিত সেখানটা নিজ হাতে কোদাল মারিয়া হাসিল করিয়াছে। তাতে অনেক বেগুন লঙ্কা শশা কুমড়ার গাছ লাগাইয়াছে। তার চারিধার বেড়িয়া দু' বছর আগে যে ফলগাছগুলি লাগাইয়াছিল, তারা স্বাস্থ্য সুন্দর সরম দেহে কত ফলই ধরিয়াছে! মধ্যে মধ্যে দু' বছরের ছোট ছোট আম কাঁঠাল কুল পেয়ারা জাম জামরুলের চারাগুলি যেন সদ্য স্নান করিয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে,। এক পাশে ছোট একটা খণ্ডে ফুলের বাগান, বেলা গন্ধরাজ গোলাপ টগর কত ফুল ফুটিয়াছে,। মালতীলতা করবীর গা বেড়িয়া উঠিয়াছে, জবার লালিমার সাথে ঝুমকার নীলিমা লাগিয়া রহিয়াছে। অতসীর হরিৎ শোভার পাশে অপরাজিতার কৃষ্ণ আভা, তারই পাশে, দোপাটির শ্বেত লোহিত শোভার সমাবেশ! সে আষাঢ় মাস, দুই একটী সেফালি ঝরিয়াছে, কামিনী গাছগুলি ছোট, এখনও ফুল ধরিবার বয়স হয় নাই, যুথী চামেলীও তাই।

ফুল বাগানের পাশেই ছোট একখানি চালঘর। সেখানে বসিয়া ললিত সকালে গরীব চাষার ছেলেদিগকে পড়ায়। ললিতের কত ভরসা এই বাগানের উপর। এই বাগানের উপর ভরসা রাখিয়া ললিত বি, এ, পাশ করিয়াও চাকরীর অনুসন্ধানে যায় নাই। তার বিশ্বাস, ক্ষুদ্র সংসার আর, বিধবা বোন, আর বালিকা ভ্রাতুষ্পুত্রী, এদের ভাত

কাপড় এতেই যোগাবে। গত বৎসর তার একশ টাকার বেগুন লঙ্কা, আলু, কপি ফলিয়াছে। এবার সে গণিয়া দেখিয়াছে, একশ কাঁদি কলা ধরিয়াছে, তার মূল্য পঞ্চাশ টাকা। ললিতের বড় আশা, তার আম কাঁটালের গাছে ফল ধরিলে সে বিবাহ করিবে, তখন তার অন্নের ভাবনা থাকিবে না।

দুলাল আগেই সেই ফুল বাগানটা উপাড়িয়া ফেলিতে হুকুম দিল। সেখানে নন্দবাবুর ইটের খোলা করিতে হইবে। আর কতক গুলি গরু আনিয়া ছাড়িয়া দিল, বেগুন লঙ্কার ক্ষেতে। মজুর যারা, তারা ফল ও ফুল গাছ কাটিতে চাহিল না। দুলাল নিজেই কাটিতে লাগিল!

ললিত ছুটিয়া আসিল বলিল, "দুলাল গাছগুলি কাট্‌বার প্রয়োজন কি? আমি এমনিই জমির দখল ছেড়ে দিলাম।"

তবু দুলাল আরও দুই একটা কাটিল। কলাগুলি পাকিবার মত হয় নাই, তবু দু'চারি কাঁদি কাটিয়া লইয়া, গরু গুলি ললিতের বিদ্যালয় গৃহে বাঁধিয়া রাখিয়া দুলাল যুদ্ধজয়ী বীরের মত লোকসহ প্রস্থান করিল। পথে যাইতে যাইতে দশ বার বলিল, "দেখলে বাবা! দুলাল চাঁদেল হেকমৎ।"

দেখিয়া শুনিয়া রমা বসিয়া পড়িল, তার মুখে কথা সরিল না। গৌরী বলিল, "আমি গিয়ে দাদুকে ব'লে আসি।"

ললিত বলিল, "না, সে গঙ্গার তোড়ের মত নেশা, পাহাড় সুমুখে পড়লে ভেসে যায়, তুই কোথায় তৃণ!"

এ সংবাদ গ্রামে রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। যে শুনিল, সেই ছুটিয়া আসিল। গ্রামের সকলই ললিতকে বড় ভাল বাসিত। ললিতের বাগানটী গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতার প্রিয় সামগ্রী ছিল।

ললিতের বাগানের শাকসবজি গ্রামবাসীরা অর্দ্ধমূল্যে বা বিনা মূল্যে পাইত। ললিতের গাছের তুলা লইয়া ব্রাহ্মণের মেয়েরা পৈতা তুলিতেন। যাঁরা চরকা কাটিতে তাঁদের তুলার দাম লাগিত না। অন্য পক্ষে নন্দকিশোর বাবু দ্বিতীয় পক্ষে দার গ্রহণ করিয়া একবারে বুদ্ধি হারাইয়াছেন, এ কথা লইয়া গ্রামে আলোচনা অনেকই হইত। আবার কেউ নন্দকিশোরকে সমর্থন করিয়া ললিতকে দোষী করিয়াও বলিত, যদি মেয়েটাকে বিবাহ করিত, তবে ত নন্দকিশোর বিবাহ করিতেন না। ললিত সে কথার কোন প্রতিবাদ করে নাই।

আজ গ্রামের লোক আসিয়া বলিল। কি সর্ব্বনাশ! এমন সাজান বাগানটা কেড়ে নেবে?

ললিত বলিল, "ও যায়গাটা আমার নয়, কাকা মশাইএর, দয়া করে আমায় দিয়েছিলেন। কি করা যাবে?"

সকলেই বলিল, "বল কি? তোমার দখলি জমি। তুমি গায়ের রক্ত জল করে আবাদ করেছ? কি সুন্দর—বাগানই হয়েছিল।

যাঁরা প্রবীণ, তাঁরা বলিলেন, "তোমার কোন দলিল পত্র নেই?"

"না, দলিল করার প্রয়োজনটা ত আমি মনে করতে পারি নাই।"

যারা অল্প বয়স্ক, অতিষ্ঠ, তারা বলিল, "দলিল আবার কি? আমরা কিছু জানি না? নন্দবাবুর সকল জমাজমিতেই ললিতের অর্দ্ধেক অধিকার। দশবছর এক অন্নেই ছিল। খাতির কিসের? বল, আমরা এখনই দখল করে দিই। গ্রামের সকলে জুটে প্রমাণ করবো।"

ললিত সকলকে বুঝাইয়া শান্ত করিল। বলিল, "আপনারা আমার

উপর এত অনুকম্পা দেখাচ্ছেন, এতে আমি বড়ই আশ্বস্ত হলাম। তবে এ নিয়ে বিবাদবিসম্বাদ করা আমার ইচ্ছা নাই। আমার যা কিছু কাকারই দেওয়া, কাকারই অন্নে এ দেহ। কাকাই লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন। তাঁর সঙ্গে এই নিয়ে মামলা মোকদ্দামা দাঙ্গাহাঙ্গামা কর্ত্তে গেলে আমার মহাপাপ হবে। আপনাদের দয়া থাক্‌লে, আমার একরূপ চলে যাবে।"

ললিত নিজে রুখিল না দেখে, সকলে নিরস্ত হইল। যারা নিতান্ত সরল বুদ্ধি তারা বড় ব্যথা পাইল, নির্দ্দোষ ললিতের এই অন্যায় অনিষ্টে। যারা মামলা বাধাইয়া পক্ষ ভুক্ত হইতে পারিলে খোসামোদ, খোরাকী ও প্রণামীর কিছু আশা রাখে, তারা ব্যথা পাইল। এত বড় বিবাদটা বাধিয়া গিয়াও বাধিল না। উকিলঘেসা আইন-জানা লোকে বলিল, "বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা, অমন কাপুরুষের কি জমি জমা থাকে?"

ললিতের দিনটা বড় অশান্তিতে কাটিল। রাত্রিতে রমার কাছে বলিল, "রমা! বুঝতে পাচ্ছ অবস্থাটা? এত বড় প্রতিশোধ নিচ্ছেন কাকা আমার উপর?"

রমা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এ কাকার প্রতিশোধ নয়, কাকীমার প্রতিহিংসা!"

ললিত যেন চম্‌কে উঠিল! দু'বছরের অতীত একটা ভীষণ রাত্রির কথা তার মনে পড়িল! সে কথা ত আর কেউ জানে'না! যার বিশ্ব-যোড়া দৃষ্টি, সেই মাত্র জানে। আর কেউ জান্‌বে না। রমা তবে কেন বলে, কাকীমার প্রতিহিংসা! রমা কি বুদ্ধিতে এত প্রখরা? সংসারের ঘটনার কি চক্র! এ যেন একটা ভীষ্মবধের পর্ব্ব! অর্জ্জুন শিখণ্ডিকে সাম্‌নে রাখিয়া ভীষ্মের বুকে বাণ মেরেছিলেন। আর নন্দকিশোর আমাকে সম্মুখে রাখিয়া মানদার বুকে আগুন জ্বালাচ্ছেন। আমাকে

সয়ে যেতে হ'বে। তাঁর কাছে অনেক স্নেহ, অনেক উপকার পেয়েছি, আমাকে সকল স'য়ে যেতেই হবে। আমি কাউকে এর ভাগী করব না। মানদাকেই বা আমি দোষী করি কেমন করে? সে যেমন বুঝেছে, তাতে এমনি করাই যে তার স্বভাব। তবে সেও স'য়ে গেলে পার্ত্ত, সকলকে ত বিধাতা তেমন সহন শক্তি দেন নাই। তবে সে একা আমার উপর প্রতিহিংসা নিতে গিয়ে, অনেক নিরীহের উপর অত্যাচার কচ্ছে! এ কথাটা তাকে বুঝিয়ে দিলে হয় না? কিন্তু তাও হয় না, শুধু ভীষ্মকে মেরেই শিখণ্ডির প্রতিহিংসা নেওয়া হতো, কিন্তু আগে সৈন্য সামন্ত না মারিলে যে ভীষ্ম মারা পড়ে না।

ললিত ভাবিয়া চিন্তিয়া অনেক বিলম্বে বলিল, "এখন ত আর পল্লীর ছায়ায় বসে আরাম করা চলে না রমা। ধানী জমির ধানও এবার পাব না, তা বোধ হয় বুঝতে পাচ্ছ রমা। অন্নের সংস্থান ত কর্ত্তে হবে।"

ধীরে রমা বলিল, "তা বটে।"

"এখন তোমার উপর অনেক নির্ভর করে। তোমায় একলাটী থাকতে হবে গৌরীকে নিয়ে। হয়ত আমি সহজে টাকা রোজগারের পথ নাও পেতে পারি, আজ কাল চাকরী বড় পাওয়া যায় না তোমাকে গৌরীকে পুষতে হবে একলা অনেক দিন। তুমি যদি তা না পার, তবে গৌরীকে রেখে আস্তে হয় তার মাসীর বাড়ী! এখন তিনি রাখবেন কি না বলা যায় না, সেই গৌরীর মা বাপ মারা গেলে রাখতে চেয়েছিলেন, এখন আমার গৌরী বিবাহ যোগ্যা! হয়ত মনে কর্ত্তে পারেন, একটা মেয়ে এনে ঘাড়ে চাপাচ্ছে।"

রমা সব শুনিল। গৌরীকে আজ অন্নের দায়ে, রক্ষার দায়ে রাখিয়া আসিতে হইবে অন্যের ঘরে! এ কথা শুনে রমার বুক ফাটিয়া বাহির

হইবার উপক্রম হইল। মনে পড়িল, দাদা বউদিদির সেই মুখ! আমার সেই গৌরী, যাকে বুকে নিয়ে আমি দাদার শোক, বউদিদির শোক, সকলের বড় স্বামীর শোক পর্য্যন্ত ভুলে আছি, আজ সেই গৌরীকে পরের ঘরে বিলিয়ে দিতে হবে! সেত রমার মরবার আগে হতে পারে না। নারীকে বলবতী করে তার স্নেহের প্রেমের স্থানে আঘাত লাগিয়া। প্রেমে আঘাত পাইলে প্রেমিকা বিশ্বদাহী অগ্নি হইয়া জ্বলিয়া উঠিতে পারে। স্নেহে আঘাত লাগিলে জননী মহিষমর্দ্দিনী শক্তিরূপে নাচিয়া উঠে! রমা যতটা দমিয়া গিয়াছিল, গৌরীকে তার বুক হইতে ছিনাইয়া আর এক স্থানে, নিতান্ত পরের মত অবহেলা, অবজ্ঞার মধ্যে গলগ্রহ করিয়া দিতে হইবে, এ চিন্তায় রমার মাতৃ-প্রাণ ফুলিয়া উঠিল! তা হইবে না, কিছুতেই না। সত্যি, এতকাল ত সে সংসারের কোনও কাজেই লাগে নাই। আজ তাকে কাজে লাগিতে হ'বে। রমা বলিল, "চিন্তা করো না, আমি সব পারবো। আমরা কি না পারি? আমা-রই ত কাদাপোরা কলসির মত স্বামী ভ্রাতার পায়ে জড়িয়ে তাদের ডুবিয়ে দিতে পারি, আবার আমরাই প্রীতির প্রদীপ জেলে তাদের কর্ম্মপথ আলোকিত করে, ডুবতে লাগলে ধরিয়ে তুলতে পারি। কেন পারব না কি ভয় আমার? প্রয়োজন হয়, আমি খাড়া ধরে লড়াই করবো, তথাপি দুর্ব্বল হ'য়ে গৌরীকে কারু দেব না। মানদার শক্তি হলো, এত বড় ঘরটা ধ্বংস কর্ত্তে, আমার শক্তি হবে না, আমার এত-টুকু সংসার বাঁচিয়ে রাখতে? ভয় নাই দাদা, আমি সব পারব।

তখন রাত্রি—আটটা। অন্ধকারে পৃথিবী ঢাকিয়া গিয়াছে। আষাঢ়ের আকাশ মেঘে ভরা। সারাদিন খুব গুমটই গিয়াছে। এখন বর্ষণের বিশেষ আবশ্যক। ঘনবিদ্যুচ্চমক, মেঘের গুরু গর্জ্জন, সমীরণের স্তম্ভন, অতি গ্রীষ্মের দাহন বিজ্ঞাপন করিতেছে, বর্ষণের

আর বিলম্ব নাই। সেই ভীষণ রাত্রিতে ভীষণ অন্ধকারে অষ্টম বর্ষীয়া বালক নিমাই ছুটে এসে রমার বুকে ঝাঁপটিয়া পড়িয়া কাঁদিল, "দিদি! দিদি! আমার মা নাই।"

"ষাট, ষাট! ও কি নিমাই? এত বড় দুঃখ তোর আজ কিসে হলো? এই অন্ধকারে তুই একা এসেছিস্।"

"দিদি! আমার মা ডাক্‌তে বড় ইচ্ছা করে।"

"তা ডাক্‌বে! ঐত মা আছেন, তাকে মা বলে ডাকবে।"

"না দিদি! তাকে আর মা ডাক্‌তে পারি না। মা ডাক্‌লে তিনি মার্‌তে আসেন। এই দেখ, আজ আমার মুখখানা কেমন চেপে দিয়েছে! বড্ড ব্যথা পেয়েছি। দেখ ফুলে উঠেছে।"

"তাই ত! আহা! এমন করে মেরেছে তোমায়।"

"বাবাও মেরেছে! দেখ পিঠখানা আমার এখনও ফেটে যাচ্ছে। আমায় আর ও-বাড়ী যেতে দিস্ না।"

"আহা সত্যিই ত। দেখেছ, ছেলের পিঠে আঙ্গুলের দাগ গুলি বসে গেছে! কি নিষ্ঠুরতা! কাকা কি সত্যিই পাগল হয়েছেন!"

"দিদি! আমি তোমাকেই মা বল্‌বো। ওকে আর মা বলবো না।"

"আমি যে তোর দিদি।"

"তোমায় দিদিও বল্‌বো, মাও বল্‌বো। আজ থেকে তোমাকে দিদি মা বল্‌বো। আমি আর ও বাড়ী যাব না।

তখন বাহির হতে নন্দবাবু অতি রুক্ষ স্বরে হাকিলেন "ললিত, নিমাই এখানে এসেছে।" ললিত উত্তর করিল না, রমা উত্তর করিল, "এসেছে।"

"দেখলে, কি দুরন্ত ছেলে? নিমে! বেরিয়ে আয়! তোর

নেহাৎ কপাল মন্দ দেখ্‌ছি। এই আকাশ ভরে বাজ গর্জ্জাচ্ছে, তুই ছুটে এলি! ওদিক সে বেচারী ত ছট ফট কচ্ছে। এমন মাকে তুই চিন্‌লি না, হতভাগা।"

রমা বলিল, "নিমাই আজ থাক না এখানে কাকাবাবু! বড় কাঁদছে।"

"না তা হবে না! বের করে দাও।"

"তুমি আজ নিমাইকে বড় মেরেচ কাকা বাবু।"

"মেরে থাকি মেরেছি! বেরিয়ে আয় নিমে।"

"আমি আজ নিমাইকে যেতে দেব না।"

"তুই কে রে নিমাইকে রাখতে? আমার সোনার সংসারটা ছারেখারে দিলি?"

রমা ঘরে ছিল, বাইরে আসিল,—স্ত্রীলোকের মাতৃস্থানে আঘাত লাগিলে সে উন্মাদিনী হইয়া ওঠে। মায়ের প্রাণ নিয়েই রমা নিমাইকে পালন করিয়াছে। বড় উত্তেজনার সময়ে নিমাইএর ব্যথা রমার প্রাণে আসিয়া আর একটা নূতন আঘাত করিল। রমা বাহিরে আসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে, উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "কাকা! একবারে পাগল হয়েছ তুমি? আমার কাছে রয়েছে নিমাই, তাই ছিনিয়ে নিতে এসেছ? যাও তুমি, আমি নিমাইকে দেবো না। ছেলে বলে নিমাইএর উপর তোমার যে অধিকার, আমি সে অধিকার মানি না,—তার চেয়ে আমার অধিকার অনেক বেশী। দেখ কাকা বাবু! কি বুঝবে তুমি মায়ের প্রাণ। আমি গর্ভে কখনও সন্তান ধরি নাই, কিন্তু পাঁচ মাসের ছেলে নিমাইকে আমি চুপে চুপে স্তন্য পান করিয়েছি, সত্যিই—নিমাইএর জন্য আমার স্তনে দুধ এসেছিল! কি জানবে, বুদ্ধি হারা বৃদ্ধ তুমি, বুকের দুধের কি টান? যাও তুমি, ছেলে আমি দেব না?

ছেলে দিয়ে তুমি কি করবে ? উন্মাদ তুমি, নিতান্ত অপদেবতা তোমার ঘাড়ে চেপেছে। তোমার ধর্ম্ম গেছে, কর্ম্ম গেছে, মান গেছে, ইজ্জৎ গেছে, তুমিও যেতে বসেছ, ছেলেও তোমার যেতে বসেছে, তোমার বংশ নাশ হচ্ছে, নিতান্ত মরণ নেশায় তুমি ডুবে আছ। যাও, নিমাই তোমার কাছে আর যাবে না, নিমাইকে তুমি ত্যাজ্য পুত্র কর।"

রমা অতি বড় মুখরার মত এক মুখে কত কথা বলিয়া যাইতেছিল, মাতঙ্গীও আসিয়াছিলেন নন্দকিশোরের পিছনে। তিনি আর কতক্ষণ রসনা সংযত করিবেন ! একেবারে মহিষ-মর্দ্দিনীরূপে কোমরে কাপড় জড়াইয়া হুঙ্কার দিয়া লাফাইয়া পড়িলেন। "তবেরে হারামজাদি ! ইত্যাদি" কর্কশ কণ্ঠে অতি কুৎসিত ভাষা ছাড়িতে ছাড়িতে মাতঙ্গী রমার ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িল। অগত্যা এবার ভগ্নীকে রক্ষা করিবার জন্য ললিতকে ছুটিয়া আসিতে হইল। ললিত রমাকে ঠেলিয়া গৃহ মধ্যে সরাইয়া দিয়া, মাতঙ্গীকেও ঠেলিয়া সরাইয়া দিল। মাতঙ্গী অমনি মাটিতে লোটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, ওগো আমায় খুন করেছেগো।"

নন্দকিশোর শাশুড়ীর অবস্থা দেখিয়া ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন, বলিলেন, "ললিত ! এত গুণ্ডামি তোর ? তুই ভদ্রলোকের মেয়ের গায়ে হাত তুল্‌লি ?"

ললিত নিতান্ত তিক্তস্বরে বলিল, "গায়ে হাত তুলিনি কাকা মশাই ! কিন্তু উচিত গায়ে হাত তোলা। আমি বুঝি, আমার এখনকার কর্ত্তব্য, ঐ গোষ্ঠি উজাড় করে এখন থেকে সরিয়ে দেওয়া ; কিন্তু তেমন শক্তি আমার কই ? তবে আজ আমি বল্‌ছি, আর বাড়াবাড়িতে কাজ নেই, সকলে ঘরে যাও, পরে যা হয় করো।"

অগত্যা তাহাই হইল। ফটিক মাতঙ্গীকে ধরিয়া লইয়া গেল,

তাঁহার যেন বড় চোট লাগিয়াছে। যাইতে যাইতে নন্দকিশোর বলিলেন, "হারে নিমে হতভাগা, এমন মা পেয়ে তুই চিন্‌লি না। রমা ডাইনীটা ছেলেটাকে কি গুণই করেছে?"

---

(১৪)

ভোলানাথ সনাতনকে লইয়া প্রথমে কলিকাতায়ই গেলেন। কলিকাতায় পৌছিয়া সনাতন শিহরিয়া উঠিল, সর্ব্বনাশ! এখানে থাকা হইবে না। সে নন্দকিশোরের সঙ্গে অনেকবার কলিকাতায় আসিয়াছে, এত বড় জনসমাগমের মধ্যে থাকিতে তাহার মোটেই ভাল লাগে না। এখানে জল মাটী পয়সা দিয়া কিনিতে হয়, এমন স্থানে সনাতনের শ্বাসরোধ হইয়া আইসে।

সহর ছাড়িয়া অনেক উত্তরে গঙ্গার ধারে বড় জঙ্গল; একটী বহু পুরাতন বটগাছ নদীতীরে শিকড়ের জটা বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই বটগাছটা ঘেরিয়া বিবিধ লতাগুল্ম জড়াইয়া পাকাইয়া জঙ্গল করিয়া রাখিয়াছে। লোকের চলাচলের রাস্তাটা একটু দূরে, কাজেই স্থানটা যেমন ছায়াশীতল, তেমনি নির্জ্জন। জঙ্গল বেড়িয়া নদীরতীরের দিক দিয়া বৃক্ষতলে যাইবার একটী সূক্ষ্মপথের রেখা আছে, সে পথদিয়া এই বৃক্ষতলে যেন কোনও জীব আশ্রয় লইয়া থাকে, খুব সম্ভবতঃ সে কোন বন্যজন্তু, বন্য শশক শৃগাল হইতে পারে। ভোলানাথ ও সনাতন সেই পথ দিয়া গিয়া বৃক্ষতলে বসিলেন। সে স্থানটা বড় মনোরম। সম্মুখে গঙ্গার

দিকটা অনেক পরিষ্কার, গঙ্গা একেবারে বৃক্ষমূল স্পর্শ করিয়াছেন, বৃক্ষের মূলের কতকটা মাটীও গঙ্গাদেবী আত্মসাৎ করিয়াছেন, বড় শিকড়গুলি জলে ডুবিয়া তরঙ্গের সঙ্গে খেলা করিতেছে। অন্য দিকটা জঙ্গলে ঘেরা। দুইটা বড়শিকড় মাটীর উপরে ত্রিভুজাকারে মিশিয়া একটী স্থানে যেন দুইখানি কাষ্ঠাসন পাতিয়া দিয়াছে, তাহার কাছে কোনও কাঁটা গুল্ম জন্মে নাই। ভোলানাথ ও সনাতন দুইজনে দুইটী শিকড় ঠেশ দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাহারা শ্রান্ত। কিন্তু স্নিগ্ধ গঙ্গাশীকরবাহী সমীরণ স্পর্শে তাহাদের শ্রান্তি অল্পক্ষণেই বিদূরিত হইল।

ভোলানাথ বলিলেন, "সনাতন, মা দেখেছিস ?"

সনাতন বলিল, "মা কি দেখা যায় দাদা ?"

"কত বড় মিষ্টি হাওয়া গায়ে লাগ্‌ছে।"

"তাত লাগ্‌ছে।"

"ঐত মা আঁচল নাড়ছেন, তাই ছেলেরা যে বড় শ্রান্ত। তেষ্টা পেয়েছে ?"

"তেষ্টা পেয়েছিল, অঞ্জলিপুরে গঙ্গাজল খেয়েছি, আরত তেষ্টা নেই।"

"ঐ ত মায়ের স্তন্য সুধা। ক্ষুধা পেয়েছে ভাই ?"

"তাত পেয়েছে। দুদিন খাই না।"

"ঘর থেকে টাকা পয়সা কিছু সাথে এনেছ কি ?"

"হাঁ ! একখানা দশ টাকার নোট ট্যাকে আছে।"

"এক্ষণি তা ছুড়ে ফেলে দাও ঐ গঙ্গা জলে। যার মা আছে তার আবার টাকা কেন ?"

সনাতন কাপড়ের খুট হইতে নোট খানা বাহির করিয়া গঙ্গাজলে ছুঁড়িয়া ফেলিল। ভোলানাথ গান ধরিল—

"মায়ের রূপে জগৎ আলো উছ্‌লে উঠ্‌ছে ভুবন ছেয়ে,
কত রবি, কত শশী লুটায় আমার মায়ের পায়ে।
নবদূর্ব্বাদলে দেখ্‌রে মায়ের রূপের ছায়া
নীলাকাশে দেখ্‌রে আমার মায়ের বিরাট কায়া।
চমকি চপলা খেলে মায়ের অঙ্গের বিম্ব নিয়ে ॥"

দেখিতে দেখিতে আকাশের পশ্চিম প্রান্তে একখানি কালো মেঘ দেখা গেল, অপরাহ্নের সূর্য্য ডুবিয়া গেল, ভরা জোয়ারের স্থির গঙ্গাবক্ষে কালো ছায়ার দাগ পড়িল। সনাতন বলিল, "তাইত, বড় একটা মেঘই করেছে।" ভোলানাথ গাহিল,—

"জলদে বরিষে বারি শীতল পীযূষধারা—
ঐত আমার শীতলা মার চরণামৃত ধারা,
বিশ্বের পিয়াস শান্তি হয় রে সে অমৃত পিয়ে।"

সনাতন বলিল, "আকাশে যে ঝড় ছাড়্‌লো। আহা এতগুলি নৌকা চল্‌ছে, ঝড়ে রক্ষা পাবেত ?

সহসা ঝড় উঠিল দেখিয়া সত্যই নাবিকেরা বড় অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে, স্ব স্ব নৌকা সাবধান করিতে সচেষ্ট হইয়াছে, সোর গোল খুবই উঠিয়াছে, সম্মুখে আবার একখানা ষ্টিমার, ছোট হইলেও সে বড় ঘরের ছেলে ভাবিয়াই যেন গৌরবে ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে সমান বেগেই ছুটিয়া আসিতেছে, সামান্য কাঠের নৌকাগুলির মত তাহার ভয় ব্যস্ততা মোটেই নাই। ষ্টিমারখানা উল্টা দিক দিয়া অনেক যাত্রী লইয়া কলিকাতায় যাইতেছিল। ভোলানাথ তাহার গানই গাহিতেছিলেন; যেন তাঁহার কত আনন্দ।

কালো মেঘে রুদ্র বজ্র ঝঞ্ঝা গরজি ওঠে
ঐত আমার রুদ্রাণী মার রুদ্রলীলা ফোটে,
ছেলের তাতে ভয়কিরে ভাই ছেলেমারে কোথা মায়ে॥

ঝড় অতি প্রবল বহিল। সনাতঁন একবারে অশান্ত হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। নৌকার নাবিক আরোহিগণের চীৎকার-ধ্বনি প্রবল ঝটিকার হুঙ্কারে মিশিয়া সমস্ত বিশ্বটা যেন হাহাকারে পূর্ণ করিয়া দিল। পশ্চিমের ঝটিকাবেগ ষ্টিমারখানা একবারে লক্ষ্যচ্যুত করিয়া পূর্ব্বতীরে ঠাসিয়া আসিল, ভোলানাথ ও সনাতনের সেই বৃক্ষমূলের কাছে আসিয়াই ষ্টিমারখানা উল্টাইয়া যাইবার উপক্রম করিল। তখনও সন্ধ্যায় আধাঁর গাঢ় হয় নাই, বিদ্যুৎও ঝলসিতেছে, আরোহীগুলি ভয়ে সকলে একত্রেই যেদিকে কূল সে দিকে ঝুকিয়া পড়িল। সনাতন যেন স্পষ্ট দেখিল, সেই ষ্টিমারে ললিত ও একজন আরোহী! সনাতন চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো, ললিত যে! গেল, গেল! ষ্টিমারত রক্ষা পায় না।"

ভোলানাথ আরও আনন্দে সুর বাড়াইয়া গাহিলেন,—

"পাগল জানে মা যে আমার কঠোরে কোমলা
ইন্দ্রচন্দ্র বুদ্ধিহারা বুঝ্‌তে মায়ের লীলা।
বোঝাবুঝি কাজ কি আমার মা ডাকি আনন্দ পেয়ে।

চক্ষের নিমিষে ষ্টিমারখানা উল্টাইয়া গেল। এতবড় একটা দমকা ঝাপট আসিল যে, তাহাতে সনাতনের শ্বাস রোধ হইয়া আসিল, ভোলানাথও আর গানের সুর রাখিতে পারিলেন না। পরক্ষণেই উভয়ে আকাশে চাহিয়া দেখিলেন তাঁহাদের মাথার উপর কোনও আবরণই নাই। সে বিশাল অশ্বত্থ তাহার এতবড় মূল-বন্ধনছিন্ন হইয়া গঙ্গাগর্ভে পড়িয়া সেই উত্তাল তরঙ্গে দোল খাইতেছে, যে ত্রিভুজাকার শিকড় দুইটার মধ্যে তাহারা বসিয়াছিলেন, সে দুইটী দুইপার্শ্ব হইতে

উপ্‌রিয়া উঠিয়া তাহাদের মাথার উপর একটা প্রকাণ্ড অজগরের বিশাল ফণার মত বিস্তৃত থাকিয়া আশ্রিত দুইটাকে যেন এই ভীষণ ঝঞ্ঝা বজ্র হইতে রক্ষা করিতেছে। সনাতন হতজ্ঞান বিহ্বল! এবার তাহাদের শিরে বর্ষার প্রবল ধারা পড়িতেছে, সেগুলি বায়ুবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া কঠোর কঙ্করের মত শরীরে বিঁধিতেছে।

ভোলানাথ বলিলেন, "সনাতন ক্ষুধা আছে?" সনাতন কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আর ক্ষুধা তেষ্টা! একি প্রলয় কাণ্ড! নিশ্চয়ই ললিত ডুবে মরেছে।

ভোলানাথ বলিলেন, "শুধু ললিত কেন? অনেক লোকইত মরেছে। আচ্ছা, সনাতন, এতবড় প্রকাণ্ড বটগাছটা মাথার উপর দিয়া পড়েগেল, আমরা ত চাপা পড়্‌লাম না।"

সনাতন বলিল, "আশ্চর্য্য বটে!"

ঝড় থামিল, মেঘ কাটিল, বৃষ্টিও থামিল। রাত্রিও আসিল, আকাশের পাশে পাশে দুই একটা তারা দেখা দিল, তবু বিদ্যুৎ ঝলসিতেছিল। ভোলানাথ বলিলেন "চল সনাতন এখানে ত আর থাকা চলে না।"

সেই অন্ধকারের মধ্যে চমকিত বিদ্যুতালোকের সাহায্যে দুইজন পথ বাহিয়া চলিল। তখন প্রকৃতি একবারেই শান্ত, গঙ্গা একেবারেই স্থির, যেন কোনও স্নেহময়ী মাতা দুষ্ট ছেলের উপর একটু কৃত্রিম কোপ করিয়া আবার শান্ত স্নেহোল্লাসে তাঁহার ঘরকন্নায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

নদী তীরস্থ একটা কারখানা বাড়ীর প্রাঙ্গনে অনেকগুলি আলো জ্বলিতেছে, সেখানে অনেক লোকের ভিড়। দুইজনে অগ্রসর হইয়া দেখিল, ঝটিকা-বিপন্ন অনেক লোক সেখানে আশ্রয় লইয়াছে। তাহাদিগকে দেখিয়া আর পাঁচজন বলিল, "তোমরাও কি নৌকা ডোবা লোক?" ভোলানাথ বলিলেন, "না।"

সেখানে যাহারা আশ্রয় নিয়াছিল, তাহাদের প্রায় সকলেই সেই ষ্টিমারের লোক। কাহারও জীবন নষ্ট হয় নাই। ষ্টিমার যেখানে ডুবিয়া গেল, সেখানেই জলের মধ্যে একটা প্রবল বটগাছ পড়িয়াছিল তাহার বিস্তৃত শাখা প্রশাখায় আশ্রয় করিয়া সমস্ত আরোহীর জীবন রক্ষা হইয়াছে, তবে জিনিষপত্র অনেক ভাসিয়া গিয়াছে। সনাতন চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, ললিতও তাহার মধ্যে আছে, দেখিয়াই সোৎসাহে বলিল, "ঐ যে ললিত?" ভোলানাথ আর সেখানে তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া সনাতনের হস্ত ধরিয়া বাহিরে আসিলেন। সনাতন বড় কাতরে বলিল, "ললিতের সঙ্গে একটু কথাব'লে আসিনা দাদা।" ভোলানাথ বলিলেন, "আর কেন? চল, মা আমাদের খাবার নিয়ে ডাক্‌ছেন, ক্ষিদে পেয়েছে না?"

দুইজন আবার চলিলেন। তখন আকাশ একবারে স্থির, মেঘের চিহ্নও নাই, চাঁদ উঠিয়াছে। তাঁহারা তখন একটা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঝড়ে গাছপালা পড়িয়া রাস্তা পথ বড়ই দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে, তবে চন্দ্রালোকে স্পষ্ট দেখিয়াই চলা যাইতেছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝড় জল, একটু বাদেই শুকাইয়া গিয়াছে, পথে জল কাদার কোনও অসুবিধা নাই।

একটা বড় বাড়ীর ফটকের ধারদিয়ে পথ। সেই বাড়ীর সম্মুখে আসিলে শোনাগেল কোনও বর্ষীয়সী জননী ডাকিতেছেন, "ওরে কে খেতে বাকি আছিস্, খেয়ে যা, কেউত সাড়া দেয়। না, তবে খেতে আর কেউ বাকি নেইত?" ভোলানাথ সনাতনকে পশ্চাতে লইয়া সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন এবং যিনি খাবার লোক ডাকিতেছিলেন, তাঁহার সম্মুখে গিয়া বলিলেন, "আমরা দুটী খেতে বাকী আছি মা।"

"তোমরা? তোমরা কারা গা?"

ভোলানাথ হাসিয়া বলিলেন, "আমরা খেতে বাকী পড়া ছেলে মা, তুমি আমাদের ডাক্‌ছিলে না মা ?"

বৃদ্ধা একটু বিস্ময়ের সঙ্গে হাতের আলোটা আর একটু উচু করিয়া ধরিয়া দুইজনের মুখ ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। তারপর বলিলেন, "আচ্ছা, ভালইত, বোস। তোমরা কি জাতি ?"

ভোলানাথই কথার উত্তর দিলেন, "আমরা ত গৃহী নই মা, আমাদের আবার জাতি কি ?"

সে রাত্রিতে ভোলানাথ সনাতন সেখানে সমাদরে আশ্রয় পাইলেন, সস্নেহে আহার পাইলেন। বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে শুইয়া পড়িয়া ভোলানাথ গান ধরিলেন—

মায়ের আদর বড় মিঠে মায়ের মতন কেবা আছে
মায়ের আঁচল ধরে ধরে, সদাই ফিরি পিছে পিছে।

সনাতন জলিল, "সত্যি দাদা ; মাকে চিনেছি।"

---

(১৫)

ললিতের অর্থে বড় প্রয়োজন, অর্থোপার্জ্জনের জন্য সাধের পল্লীবাস ছাড়িয়া সহরে আসিল। ললিতের সঙ্কল্প কল্পনা, জীবনের লক্ষ্য সকলই উল্টাইয়া গিয়াছে। ললিত লেখাপড়া শিখিয়াছিল যথেষ্ট, রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিয়া সত্যিকার বিদ্যাই সে অর্জ্জন করিয়াছিল। সে দেখিল পল্লীর অবস্থা বড়ই শোচনীয়। যাহারা স্কুল কলেজে লিখিতে পড়িতে শেখে, তাহারা বিষয় কর্ম্মে সহরেই বাস করে ; সেখানে উপার্জ্জন যাহা করে,

ব্যয় করে তাহার চেয়ে বেশী, ইচ্ছা থাকিলেও পল্লীর দিকে চাহিবার শক্তি তাহাদের থাকে না। পল্লীতে থাকে নিরক্ষর কৃষকদল, আর শিক্ষিত চাকুরীজীবি সহর প্রবাসী ভদ্রলোকগণের নিঃসহায় বৃদ্ধ মা পিসি বা বিধবা বোন্। আর একদল স্কুল ছাড়া অকর্ম্মা ছেলে, তাহারা তেড়িকাটে, দাড়িছাটে, ফুটবল খেলে, থিয়েটার করে, অন্য রকম অপকর্ম্মও করে। ইহারা পান করে পানাপুকুরের পচাজল, বাস করে আবর্জ্জনা জঙ্গলে ঘেরা মশা-ভরা ভিজে বাড়ীতে, রোগ হইলে কব্‌রেজ মশায়ের লক্ষীবিলাস বা কশা শিকড় সম্বল। দুই এক জন মুনিব মহাজন আছেন, তাঁহারাই পঞ্চায়েত, প্রেসিডেণ্ট, স্কুলের সম্পাদক ইত্যাদি। আত্মোদর পূরণ ভিন্ন অন্য বিদ্যা তাহারা জানেন না। ললিত এই সব দেখিয়া সঙ্কল্প করিল, সে তাহার সমস্ত বিদ্যা ও শক্তি দিয়া পল্লী জননীর সেবা করিবে, পল্লীর সুখ স্বাস্থ্য বিধান করিয়া পল্লীকে যথার্থ সুখের স্থান করিয়া লইবে। পল্লীর অকর্ম্মা বালকদিগকে লইয়া সে একটী দল গঠন করিয়া, কার্য্য আরম্ভ করিযাছিল। তাহার কাকাবাবু অনেকদিন বলিয়াছিলেন, তাহার মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা তিনিই করিবেন, করিতেও ছিলেন। এখন আর ললিত সে সঙ্কল্প রাখিতে পারিল না, মাতৃপিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রী ও বিধবা ভগিনী এ দুটীরও অন্ন সংস্থান তাহার নাই, তাহার উপর আবার গৌরীব বিবাহ ভার। ললিত বড় দুঃখে পল্লীজননীর পায়ে প্রণাম করিয়া বিদেশে যাত্রা করিয়াছিল।

কলিকাতায় নানা স্থানে চাকরীর চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন বড় অসময়,—চাকরীর অসময় সর্ব্বদাই, ললিতের চাকরী মিলিতেছেনা। যাহারা ললিতের চেনা জানা লোক, তাহাদের কাছে গিয়া ললিত কোনও ভরসাই পাইল না, বরং যাহারা তাহাকে ধনবান নন্দকিশোরের

ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া পূর্ব্বে যথেষ্ট খাতির করিতেন, এখন উমেদার দেখিয়া অবহেলার ভাবই দেখাইলেন।

এ মহানগরীতে এক বড়বিপদ, মাথা রাখিয়া দাঁড়াইবার স্থান পাওয়া দুর্ঘট। নন্দকিশোর তাঁহার বাড়ীটী ভাড়া দিয়া এখন সহর ছাড়িয়া স্বঘরেই বাস করিতেছেন। ললিতের সে বাড়ী যাইবার অধিকার নাই।

ললিতের পাঠ্যাবস্থায় একজন সদাশয় অধ্যাপকের সঙ্গে তাহার বড় পরিচয় ছিল। অধ্যাপকটীকে সে বড় পরপ্রেমিক বলিয়াই জানিত। কতবার দুর্ভিক্ষ বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়-পীড়িত জনগণের সাহায্যার্থ তিনি সভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। পশ্চিমাঞ্চলে এক-বার দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে তিনি নানাদেশ ঘুরিয়া বক্তৃতা করিয়া অনেক টাকা তুলিয়া অনাহারীদিগকে আহার দিয়াছিলেন। ললিত অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু শুনিয়া বিস্মিত হইল, সেই সুবক্তা সুবিদ্বান্ অধ্যাপক একটী দরিদ্র সাহায্য ভাণ্ডারের টাকা আত্মসাৎ করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া এখন কারারুদ্ধ!

ললিত একটী স্ত্রীলোকের হোটেলে আশ্রয় লইয়া কর্ম্মের চেষ্টা দেখিতে লাগিল। মধ্যে বড় বিপদ হইয়া গেল, প্রবল ঝড়ে ষ্টীমার ডুবি হইয়া মরিতে গিয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। সঙ্গে অর্থাদি যাহা ছিল সমস্ত খরচ হইয়া গিয়াছে। হোটেলের টাকা বাকি পড়িয়াছে। হোটেলওয়ালী বড় কড়া কথায় শাসাইয়াছে, টাকা না দিলে আর সে আহার যোগাইতে পারিবেনা।

ললিত সমস্ত দিন ঘুরিয়া, শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুধার্ত্ত দেহমনে রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল, এতবড় এই মহানগরী, দালান কোঠায় মহা-সমুদ্র, ঐশ্বর্য্য সম্পদের লীলাস্থান, আজ দুইমাস চেষ্টা করিয়াও আমি

এখানে দুটী অন্নের সংস্থান করিতে পারিলাম না! এই মহানগরীর এই সাজ সজ্জা অনন্ত বিলাস, এ সব কোথা হইতে আইসে? পল্লীর বক্ষশোণিত শোষণেইত এই ঐশ্বর্য্য বিলাসের সৃষ্টি। ঐ যে সাবানের কারিকর সৌধ গড়িয়াছেন, অলঙ্কার ব্যবসায়ীর রাজভবন নির্ম্মিত হইয়াছে, বিস্কুটের ব্যপারী আট টাকার ব্যবসায়ে আটলক্ষ করিয়াছেন—এসব কি শুধু তাঁহাদের সামর্থ্য গুণে, না বিধাতার কৃপা ইহাতে কিছু আছে? আমি যে মাসে ত্রিশটী টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিলেও তুষ্ট হইতাম, তাওত মিলিতেছে না। শীঘ্র মিলিবে এমন ভরসাত দেখিতেছি না।

আজ হোটেলে প্রবেশ করিতে ললিতের ভয় হইতেছে, হোটেল-ওয়ালী বড় রুক্ষ ভাষায় তাগিদ করিয়াছে, আজ তাহাকে টাকা দিবার কথা ছিল, একজন বন্ধুব্যক্তি ললিতকে দুটী টাকা ধার দিবেন বলিয়াছিলেন, তিনি তাহা দেন নাই। আজ সে হোটেলওয়ালীকে কি বলিবে? হোটেলেয় সম্মুখ রাস্তায় দাঁড়াইয়া সে ভাবিতেছিল, তাহার কান্না আসিতেছিল। একজন হকার হাকিয়া গেল, গরম চা, আর একজন হাকিল, রুটি বিস্কুট, ক্ষুধাতৃষ্ণায় ললিতের দেহ কাঁপিতেছিল, কিন্তু একটী পয়সাও কাছে নাই।

গেটের দ্বার খুলিয়া হোটেলওয়ালী দেখিল ললিত দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়াই তাহার ক্রোধে মাথা ঘুরিয়া গেল। ললিত বোধ হয় দ্বারের গোড়ায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে, সুবিধা পাইলেই বিছানাপত্র লইয়া পলাইয়া যাইবে, এরূপ আরও কত জনে করিয়াছে। সুতরাং ব্যবসায়িনী কোপবিকৃত কণ্ঠে বলিল, "কি হে ললিতমোহন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছ? দাও দিখি টাকা কটা' আমি চালওয়ালার ধার শোধ দিয়ে আসি।"

ললিত অতি কাতর কণ্ঠে বলিল, "আজত টাকা হলোনা মা।"

"তা আগে থেকেই বোঝা গেছে! আজ খাবার সময়ে মাছের ঝোলের বড় বাটী।"

ললিত আরও কাতর,—প্রায় কাঁদিয়াই বলিল, "আর কিছু দিন সবুর করো মা! তোমার টাকা না দিয়ে আমি যাব না, আমি ভদ্রলোকের ছেলে।"

তা বুঝতে পেরেছি, মাসটা বয়ে যায়, তিনটী মাত্র টাকা দিয়েছ, ছ' সাত টাকা বাকি। মাসভরে ছ' সাত টাকা কামাতে মুটে মুজুরেও পারে, কাজ নেই বাবু আর আমার মহাজনীতে। আজ আর বাড়ীর ভিতর ঢুকো না; দাও গায়ের ঐ চাদরখানা আর কোট্‌টা খুলে দাও দেখি। তারপর যেখানে ইচ্ছে চলে যাও।"

দীর্ঘস্থূল-কলেবরা মুখরা ব্যবসায়িনী ললিতের কাঁধের চাদরখানা ধরিল। ললিত কোনও কথা না বলিয়া চাদর ও জামাটী খুলিয়া তাহার হাতে দিল। পাষাণী তাহা গোছাইয়া লইয়া চলিয়া গেল, যাইবার সময় বলিয়া গেল, "যা ব্যাটা, মুটেগিরি কর গিয়ে, চাকরী করা তোর পোষাবে না, হাবা ব্যাটা কোথাকার?"

ললিত আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। আর কিছু না হউক, খানিকটা জল না খাইতে পাইলে তাহার দেহ চলে না। রাস্তার পাশে একটা কল দেখিয়া জলপান করিবার আশায় সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। পাড়ার অনেকগুলি গরীবের স্ত্রীলোক কল হইতে জল নিতেছিল, ললিত দাঁড়াইয়া অবসর খুঁজতেছিল। একবার একটু ফাক পাইয়া সে কলের কাছে গিয়াছিল, কিন্তু একটী হিন্দুস্থানী রমণী হাক দিয়া বলিল "সর্ যা, হাম্‌কো বহুৎ দেরী হো গিয়া।"

সকলের যখন জল নেওয়া হইয়া গেল, তখন রাত্রি সাড়ে সাত

বাজিয়া গিয়াছে, কলে আর জল নাই। অগত্যা ললিত গঙ্গার দিকেই চলিল।

এই যুগে কি এমন লোকের কলিকাতার সহরে কর্ম্ম জুটে?

---

(১৬)

দুই মাসেরও অধিক ললিত চাকুরী খুঁজিতে কলিকাতায় গিয়াছে, আগে সপ্তাহে একখানি পত্র আসিত, আজ কাল তাহাও আইসে না। রমা বড় ভাবিত হইয়াছে। রমা জানে তাহার ভ্রাতা বিস্তর লেখা পড়া জানেন, চাকুরী তাহার অবশ্যই জুটিবে, এতটুকু ক্ষুদ্র সংসার চালাইতে তাহাদের ভাবনার বিষয় কিছুই নাই। এতদিন ললিত যে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করেন নাই, এইটাই তাঁহাব গুরুতর অন্যায়।

রমা একাকিনী, গৌরী ছাড়া আর কেহই তাহার সহচরী নাই, নিমাই আর আসে না, তাহাকে ওবাড়ী হইতে আসিতে দেয় না। সে আজ কাল দেখিতে পায়, মানদা নিমাইকে বেশ একটু যত্ন আদর লয়। নিমাইও সেদিন চুপে চুপে আসিয়া বলিয়া গিয়াছে, সে ভাল আছে।

সনাতন চলিয়া গিয়াছে, সে রমাকে বড় ভাল বাসিত; সে থাকিলে রমা তাহার সঙ্গে দুদণ্ড কথাবার্ত্তা বলিয়া কাটাইয়া দিতে পারিত। দুলালচাঁদ মাঝে মাঝে আইসে, তহোর কথাবার্ত্তা ভাব ভঙ্গিতে হাসিপায় বটে, কিন্তু বড় ঘৃণাও করে। তবু রমা দুলালচাঁদ আসিলে একবারে তাড়াইয়া দেয় না। তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া তাহার মূর্খতার ভিতর দিয়া রমা তাহার কাকাদের বাড়ীর অনেক খবর লইয়া থাকে।

ললিত ও রমার উপর এতবড় অত্যাচার করা দুলালচাঁদেরও ভাল লাগে নাই। ললিতের এত যত্নের সাজান বাগানটী এমন নিষ্ঠুরভাবে দখল করিয়া নেওয়া অতি বড় গর্হিত হইয়াছিল, তাহা দুলালচাঁদ বিলক্ষণই বুঝিয়াছিল। মানদা ও তাহার মাতা ললিতের উপর এই অত্যাচার করিতে নন্দকিশোরকে উত্তেজিত করিয়াছিল, ললিত গৌরীকে দুলালের সঙ্গে বিবাহ দিতে অসম্মত হওয়াতেই এই অত্যাচারের অবতারণা হইয়াছে। দুলাল কিন্তু গৌরীকে বিবাহ করিতে মোটেই ইচ্ছুক নয়। সে চায় রমাকে। রমাকে বিধবা বিবাহ করিয়া সে সংসারে দৃষ্টান্ত রাখিতে চায়, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত। দুলাল কিছু দিন কলিকাতায় নন্দকিশোরের বাড়ীতে বাস করিয়া আসিয়াছিল, তখন একজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোক নন্দবাবুর বাড়ীর পাশে বাস করিতেন, তাঁহার সঙ্গে দুলালের পরিচয় ঘটিয়াছিল। দুলাল তাহার মুখে শুনিয়াছে, বিধবাদিগের পুনরায় পতিগ্রহণ দূষণীয় নহে, পুরুষ,—যেমন নন্দকিশোর, বৃদ্ধ বয়সে বিপত্নীক হইয়া দার গ্রহণ করে, আর নারী বারবছরে পতিহীন হইয়া সারা জীবন একাদশী করিয়া কাটাইবে, এটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর নীতি। দুলাল বিদ্যাবুদ্ধিহীন মূর্খ হইলেও এই কথাটা যেন ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। নন্দকিশোরের বৃদ্ধ বয়সে তাহার ভগিনীকে বিবাহ করা, আর এমন সুন্দরী যুবতী রমার বিধবা অবস্থা, এই দুইটী ঘটনা পাশাপাশি পড়িয়া দুলালকে ব্যাপারটা যেন বিশেষ হৃদয়গ্রাহী করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছে। সত্যই রমার আশা দুলাল ত্যাগ করিতে পারে না। কি করিয়া যে দুলাল তাহার অন্তরের এই গূঢ় রহস্য রমার কাছে নিবেদন করিবে, তাহা দুলাল দিন রাত্রিই ভাবে। রমা যদি তাহার হয়, তবে সমাজ তাহাকে ত্যাগ করুক, নন্দকিশোর ত্যাগ করুন, তাহার মা বোন ত্যাগ করুন কিছুতেই দুলাল ভয় পায় না। সে সব ছাড়িতে পারে, রমাকে

পাইলে। না হয়, সে রমাকে সঙ্গে লইয়া বৈষ্ণবের আখড়ায় ভেক লইয়া ভিক্ষা করিয়া খাইবে, কিন্তু রমাকে তার চাইই।

তাই দুলাল রমার কাছে যায়, রমার ঘরের বারাণ্ডায় গিয়া বসে। রমাও তাহার সঙ্গে দুই একটা কথা বলে। দুলাল একদিন চোক্ মুখ কেমন অস্বাভাবিক বিকৃত করিয়াই বলিল "দেখ ভাই, তুমি আমায় মামা বল্লে আমাল বলো লজ্জা কলে।"

রমা হাসিয়া বলিল, "তা বেশ, তোমায় এখন মামা না ব'লে দাদা বল্‌বো, তুমি যে আমার কাকা মশায়ের পোষ্যিপুত্র।"

দুলালও বড় হাসিয়া বলিল, "তা বলো, এ দুনিয়ায় সবাইত ভাই ভাই।" সেই সঙ্গে দুলাল কত হাসিই না হাসিল।

রমা একদিন বলিল, "দুলাল তুমি না কি মদ খাও, ছি ছি!"

দুলাল যেন কত লজ্জিত হইয়া বলিল, "তাইত, ফতিক দা খেতে বলে, তুমি যদি না বলো, তবে আল্ কখনই খাবো না।" দুলাল এতটা খাতির তাহার মা বোন বা নন্দকিশোরকেও করে নাই।"

এই সকল কথার ছলে দুলাল নন্দকিশোরের ঘরের কথা অনেকই রমার কাছে প্রকাশ করিয়া বলে। মানদা ও তাহার মাতা নন্দকিশোরকে বলে, গৌরীকে জোর করিয়া নিয়া দুলালের সঙ্গে বিবাহ দিতে, নন্দকিশোর তাহাতে রাজি নয়, দুলাল নিজেও তাহাতে রাজি নয়। নন্দকিশোরের যে ব্যামো হইয়াছে;—জ্বর, কাশি, বাত, আর বেশীদিন বাঁচিবে না। দুলাল বলে, ললিতের একটা বিবাহ দিয়া বউ আনিতে, রমা এমন করিয়া ভাইএর ঘর আগলাইয়া আর কতদিন জীবনটা বাজে কাজে খুইয়া দিবে। ললিতের জিদ, সে বিবাহ করিবে না। এ বড় অন্যায়, সে কি রমাকে তাহার চিরকালের দাসী পাইয়াছে। ললিতটা নিতান্ত একটা গোঁয়ার, সে যদি মানদাকে বিবাহ করিত, তাহা হইলে

কি মানদার এত দুঃখ হয়, না নন্দকিশোর এমন করিয়া মরে। ইত্যাদি দুলাল চাঁদের সোজা কথাগুলিতে রমা আনন্দ পাইত, এবং তাহার এই মূর্খতার ভিতরেও যে মনুষ্যত্বের সরল জ্যোতি আছে তাহা বুঝিয়া রমা সত্যই ললিতকে মনে মনে একটু শ্রদ্ধাও করিত। কিন্তু মাঝে মাঝে বড় বিরক্ত হইত, সে যখন ঠাকুর পূজা করিতে বসিত বা তুলসী গাছ স্নান করাইত, তখনও দুলাল আসিয়া বোকার মত বলিত, 'ওসব পুতুল পূজা করে লাভ কি, তুলসী গাছে জল ঢালিলে আবার পুণ্য কি ?

এইরূপ ঘনিষ্ঠতার ভিতর দুলাল বুঝিল রমা তাহার উপর বিরূপ নয়, তাহার অনুকূল বটে; তবে স্ত্রীলোক, লজ্জার খাতিরে কিছু স্পষ্ট বলিতে পারে না। আমি দুলালচাঁদ পুরুষ হইয়াও ত লজ্জায় আসল কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছি না, আর রমাত অবলা স্ত্রীলোক বালিকা মাত্র।

দুলাল একদিন ফটিকের কাছে মন খুলিয়া বলিল, রমা নিশ্চয়ই তাহাকে ভাল বাসে। ফটিক হাসিয়াই বলিল, "তুমি না কি আর মদ খাবে না দুলাল।"

"না ভাই, ওতে লমা লাগ কলে।"

"দূর বোকা, সতী সাধ্বী গৃহিনীর কথায়ত কোন মাতাল মদ ছাড়ে নাই, তুমি একটা লুব্ধ আশ্বাসে এমন ফুর্ত্তিটা ছেড়ে দিলে।"

"তা যাই হোক্, মদ আমি ছোবই না। সে যদি ভাত্ ছাল্‌তে বলে, তাতেও লাজি, মদ ত মদ।"

ফটিক বিস্মিত হইল, এ মূর্খের কি প্রেমের এত গভীরতা! কিন্তু রমা বলিলে কিনা করা যায়? রমা! আমি কি ভাল হইতে পারিতাম না, ভাল কি আমি ছিলাম না? আমায়ত ভাল হইতে কেউ বলে না।

ফটিকের মুখ ভার দেখিয়া দুলাল বলিল, "লাগ কলোনা ফটিকদা,

আমি মানদার কাছ থেকে তোমার মদের টাকা এনে দেবো। তুমি আমায় বলে দাও, কেমন হলে রমা আমার হবে? আমি বলি একখানা পত্তর লিখে মনের কথা জানাই, মুখেত জানান যায় না।"

ফটিক বলিল, "তাই বেশ, পত্র লেখ।" মোদ্দা দুলালের কথাগুলি তাহার মোটে তৃপ্তিকর বোধ হইতেছে না।

কথাটা দুলালের বড় মনঃপূতই হইল। দুলাল রমাকে পত্র লিখিতে বসিল। মোটা মোটা করিয়া মনের কথাগুলি খুলিয়া কাটিয়া ছাটিয়া মুছিয়া খুব লম্বা একখানি পত্র লিখিল।

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী রমাসুন্দরী দেবী—

পরম প্রিয়তমা চিরায়ুষ্মতী শ্রীচরণকমলেষু—

রমা! রমাসুন্দরী আমার প্রাণেশ্বরী!—তোমার দুঃখভরা চাঁদবদন খানি দেখে প্রাণে যে প্রেমের ঢেউ উঠিয়াছে, তা আর চেপে ধরে রাখিতে পারিলাম না। আমি তোমায় দিব্যি করিয়া বলিতেছি, গৌরীকে আমি বিবাহ করিব না, তোমার জন্য আমার প্রাণ কালী হইয়া যাইতেছে। তুমি বিধবা, জগতে তোমার কেহই নাই, ভাই বল বন্ধু বল, নারীর পতি না থাকিলে তাহার কেহই নাই। প্রাণের সাধ আহ্লাদের কথা তুমি কাহাকেও বলিতে পার না।

আহা কি দুঃখ তোমার! তবে ভাই তোমার বড় লজ্জা। লজ্জা থাকা অবশ্যই ভাল, মানদার মত বেলজ্জ হওয়া মোটেই ভাল নয়, তবে অত লজ্জা ভাল নয়। আমারও ভাই বড় লজ্জা, তাইত মনের কথা খুলে বলিতে পারি না। তোমার ভাবনা নাই, দুঃখ করিও না, তোমাকে আমি আমার করিবই। অবশ্য এই পত্রখানির উত্তর দিও। কোনও ভয় নাই, আমার মার বাক্সে অনেক টাকার নোট আছে, বুড়ো জামাইকে ফাঁকি দিয়ে মা অনেক পুজি করে বসিয়াছে। সেটা আমি

যখন ইচ্ছা বাক্স ভাঙ্গিয়া নিতে পারি। তাতে পাপ হবে না, ওত পাপেরই টাকা। অবশ্য পত্রের উত্তর দিও মাথা খাও, পত্র না পাইলে মারা যাইব।

আমি চাতকিনীর মত পথ চেয়ে রইলাম। তোমার দুঃখে আমার প্রাণ ফেটে বিদীর্ণ হয়ে যায়। তুমি যেদিন একাদশী কর, সেদিন আমার গলা দিয়া ভাতের গ্রাস নামে না। তোমার সোণার অঙ্গে থান কাপড় দেখে আমি যা করি, যা ভাবি, তা তোমায় কি জানাব। মেয়ে লোকের যে বিধবা বিয়ে হ'তে পারে, তা আমি খুব খাটি ভাবে বুঝে নিয়েছি। আমায় তুমি ভুলে যেও না, আমিও তোমার চাঁদবদন কখনও ভুলি না। তোমার বিরহে আমার হাড় কালী হয়ে যাচ্ছে। তুমি যদি বল, তবে কালই আমি তোমায় নিয়ে পাদ্রী সাহেবদের কাছে যাই। আমার তাতে মোটেই ভয় করে না। তোমার সমাজে বিচার নাই। আমি এমন সমাজ চাই না। ইতি

তোমার প্রাণাধিক,
শ্রী দুলালচাঁদ।"

রমা পত্র পাইয়া পড়িল। পড়িয়া হাসিয়া, পত্রখানা ছিড়িয়া ফেলিল। যে দাসীটী পত্র দিতে গিয়াছিল, সে আসিয়া বলিল, রমা অনেক হাসিয়াছে। দুলাল ভাবিল, বটেইত, হাসিবে না। আমি যদি রমার অমনি এক খানি পত্র পাই, তাহ'লে হেসে যে আড়ষ্ট হয়ে যাই।

এদিকে ফটিক মানদার অযাচিত অনুগ্রহ ভোগ করিতেছে। সে প্রেম নয়, মানদাও জানে প্রেম নয়, ফটিকও জানে প্রেম নয়। সে জিনিষটা হৃদয় হইতে উঠে না, দেহেই তার উৎপত্তি, দেহেই তার লয়। যেমন ক্ষুধার অন্ন, না খেলে নয়। পুত্রশোকীও খায়, পতিহারা বিরহিনীও খায়, মোটামুটি ডাল ভাত খেয়ে এক রকম দেহরক্ষা করা চলে।

ফটিক ভাল মানুষটীই ছিল। বিধাতা তাকে সুন্দর রূপ দিয়াছিলেন, মিষ্ট ভাষা দিয়াছিলেন, প্রখর বুদ্ধিও দিয়াছিলেন। কিন্তু ছোট বংশে তাহার জন্ম হইয়াছিল। ফটিক আপন চেষ্টায় লেখাপড়া শিখিয়া ভদ্রজনোচিত সকল আদব কায়দাই শিখিয়াছিল। তাই তার মনে আশাও জাগিয়াছিল খুব বড়। রমার যখন বিবাহযোগ্য বয়স, তখন ফটিক সর্ব্বস্বপণে রমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। সমাজে বলিল, তা হইতে পারে না, ফটিক সমাজে অচল। নন্দকিশোরই বংশের অপযশ হইবে ভাবিয়া, সমস্ত ব্যয় নিজে দিয়া রমার বিবাহ দিলেন ভাল বরে, সদ্‌বংশে। ফটিক সেদিন ভাবিল, এ গ্রাম এ সমাজ ছেড়ে সে আর এক গ্রামে আর এক সমাজে যাইবে। নচেৎ সে ছোট, কখনও বড় হইতে পারিবে না। তারই আয়োজন করিতেছিল, এমন সময়ে রমা বিধবা হইয়া ভাইএর বাড়ী আসিয়া আশ্রয় লইল। ফটিক ছোট বংশের ছেলে ঠিক, যেন প্রতিহিংসা চরিতার্থ হইল ভাবিয়া প্রথমেই একটু খুসি হইল। তারপর রমার সদ্যো-বৈধব্য-ম্লান মুখখানি দেখিল! তাহার বুকে গিয়া আঘাত করিল। সে যে সত্যই রমাকে একদিন ভালবাসার চক্ষে দেখিয়াছিল!

ফটিকের সে গ্রাম ত্যাগ করা হইল না। সে যদি অসদ্‌ভাবেও এখন রমাকে পায় তাহাতেও সে চরিতার্থ হইবে। রমার আশা তাহার প্রাণে আবার জাগিয়া উঠিল। এমন সময়ে নন্দকিশোর তাহাকে ডাকিলেন। নন্দকিশোরের উপর তাহার জাতক্রোধ, সে বাধা না দিলে ললিত তাহাকে বোন বিবাহ দিতে রাজি হইত। তথাপি নন্দকিশোর যখন ডাকিলেন, তখন ফটিক নন্দকিশোরের তাবেদারী লইল। তাহাতে তাহার উদ্দেশ্য বড় নৃশংস।

সেই সুযোগে মানদা, ফটিককে আক্রমণ করিল। ফটিক দেখিল

ক্ষতি কি? ইহাতেও নন্দকিশোরের প্রতি তাহার জ্ঞাতক্রোধের প্রতিহিংসা নেওয়া হইবে। মানদার রূপ গুণ ঐশ্বর্য্য যতই থাক্ না কেন, ফটিকের হৃদয়ে এ অগ্নি-রশ্মিশালিনী রূপসীর স্থান হইতে পারে না। সে হৃদয়ে যে প্রতিমার প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে, তাহা বড় স্নিগ্ধ, বড় পবিত্র, তাহা চূর্ণ করিয়া ফটিক সেখানে আর কোন প্রতিমা গড়িতে পারিবে না, প্রাণান্তেও নয়। এখনও যে তাহার আশা আছে, তাহার কাম্য মিলিবে! মিলে ভাল, যদি বা নাই মিলে, তবু সে আপনি সাধিয়া তাহাকে তাহার অযোগ্য অপবিত্র কিছুতেই করিবে না। তবু মানদাকে লইয়া তাহার খেলিবার ইচ্ছা হইল।

সেই খেলাই চলিতেছিল,—মানদা ফটিককে আদর করে ব্যঙ্গশ্লেষে কথা বলে, কত ফল মিষ্টান্ন খাইতে দেয়, মাসে দশবার নিমন্ত্রণ করে। মানদা ফটিককে সময়ে সময়ে দশ বিশ টাকা বা দুই একটী আংটী ঘড়িও উপহার দেয়, ফটিক কিছুই দেয় না, কেবল নেয়! মানদা ফটিককে দেখিলে হাসে, ফটিক মানদার সম্মুখে হাসিয়া কথা বলে! কিন্তু উভয়ে প্রতারিত, এই সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি কেহই বুঝিতে পারিতেছেনা, তাহাই আশ্চর্য্য!

এখন ফটিকের সঙ্গে রমার বড় দেখা হয় না, রমা সর্ব্বপ্রযত্নে ফটিকের চক্ষের অন্তরালে থাকে! সে দিন রাত্রিতে নন্দকিশোরের সাথে 'ফটিক গিয়াছিল রমার বাড়ীতে, যে দিন রমা বড় জ্বালায় মুক্তকণ্ঠে নন্দকিশোরকে তিরস্কার করিয়াছিল, সে দিন বিদ্যুৎ-আলোকে ফটিক দেখিয়াছিল রমার মুখ, রমার উজ্জ্বল নেত্রের দীপ্ত আভা! আহা! কি সুন্দর শোভা! কি স্পষ্ট বীণার তানের চেয়ে মধুর সে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর! বহুদিনের নির্ব্বাপিত প্রায় অগ্নি ফটিকের, যা মানদা ভোগ দিয়া চাপিয়া নিভাইয়া দিতেছিল, তা আবার জাগিয়া উঠিল! ফটিক ভাবিল, কি ছার মানদা

তুমি রাক্ষসী! বিষদন্তী কালসাপিনী! হৃদয় কোথায় তোমার? আর রমা! কি মহান হৃদয় তার! কি পবিত্র। কত স্নিগ্ধ প্রীতিময়!

ফটিক ভাবিল, এমন সহস্র মানদাকে ভোগ করিয়াও রমার তৃষ্ণা মিটে না। দুলাল সত্য বলিয়াছে, সে মূর্খ, কিন্তু তার হৃদয় আছে, সে মানদার হৃদয় চিনিয়াছে। সত্যই যদি রমা বিধবা বিবাহে রাজি হয়, আমি একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব। আমি মানদার মত করিয়া আমি রমাকে চাই না, রমাকে চাই আমি হৃদয় দিয়া ভোগ করিতে, পারি ভাল, নচেৎ এ ভোগের অভিনয় আর ভাল লাগে না।"

এইরূপ একদিন ফটিক, রমাকে নির্জ্জনে পাইয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। ফটিককে দেখিয়া রমা মুখ ফিরাইল। ফটিক বড় কাতরে বলিল, "কুকুর ঘরে এলেও গৃহস্থ তার দিকে চেয়ে দেখে রমা। আমি একটা কথার জন্য এসেছি।"

রমা চাহিল! জলভরা, কাতর নয়নে চাহিল। ফটিক বলিল, "তুমি কি আমায় ঘৃণা কর রমা।"

রমা স্পষ্ট বলিল, "করি।"

"বরাবর কর্ত্তে? না এখন কর?"

"বরাবরের কথা বরাবর ছিল, এখনকার কথা এখন বলি।"

"আমার বুকের ব্যথা তুমি কোনও দিন বুঝ্‌তে পেরেছ রমা?"

"যে জ্বালা জুড়াতে আগুনের কাছে যায় তার আবার জ্বালা ব্যথা কি?"

"যে তা চায় না।"

"সে জ্বালা নিয়েই জুড়িয়ে থাকে।"

"রমা! তোমার কি ভয় কচ্ছে?"

"কেন?"

"আমার মত লম্পট তোমার কাছে দাঁড়িয়ে।"

"আমার কাছে দাঁড়িয়ে আমার একজন স্বজন, যিনি আমায় বড় ভালবাসেন।"

"তবে যে আমায় ঘৃণা কর।"

"লম্পটকে ঘৃণা কে না করে?"

"কোন্ সুখের আশায় আর সংসারে সাধু থাক্‌তে যাব রমা?"

"পাপীর আত্মসান্ত্বনা এইরূপই অসার বটে।"

"রমা! আমি এখনও ভাল হতে পারি।"

"কিসের জন্য?"

"তোমার জন্য।"

"ইহকালে নয়।"

"রমা, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সিদ্ধ।"

"আমার বিশ্বাস হয় না।"

"আর একটা কথা বল রমা। এখনও যদি আমি ভাল হই, তবে পরকালেও তোমার যোগ্য হ'তে পার্‌বো।"

"দেবতা হলেও, বিধবা হিন্দু রমণীর পর পুরুষ কখনই যোগ্য হয় না।

রমা আর দাঁড়াইল না। ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। ফটিক ধীরে ধীরে চলিয়া আসিল। ফটিকের বড় ইচ্ছা করিতেছিল, সে একবার রমাকে বলিয়া আইসে, মানদা সম্বন্ধে সে কায়মনে নিষ্পাপ, রমা বিশ্বাস করুক আর নাই করুক। পাষাণী রমা সে কথাটা শুনাইবার জন্য একটুও অবসর দিল না। ফটিক বড় ক্ষুণ্ণ হইয়াই চলিয়া আসিল।

———

পথে যাইবার সময় খিড়্‌কি দরজায় দাঁড়াইয়া মানদা ফটিককে ডাকিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। নন্দকিশোরের বাড়ীর পিছনে ছোট একটী পুষ্করিণী, তাহার চারি পাশে ফুলের বাগান। প্রাচীরের গায়ে লতা পাতা জড়ান। ফুলগাছগুলি অযত্নে জঙ্গলে বেড়িয়াছে। মানদা ফটিকের হাত ধরিয়া সেখানে গিয়া বসিল। মানদা বলিল, "ফটিক! তোমার কি আমার কাছে আস্‌তে ভয় করে?"

ফটিকের এতদিন ভয় করুক আর না করুক, আজ বড় ভয় করিতেছিল। বলিল, "ভয় করে বই কি?"

"কিসের ভয়? আমার কাছে তোমার ভয়?"

"পাপের ভয় কি এড়ান যায়?"

"পাপ! যাও, ওকি কথা? পাপেরইত সংসার। পুণ্যবান কে ফটিক? নন্দকিশোর পুণ্যবান? ললিত পুণ্যবান? রমা পুণ্যবতী? সংসার একটা পাপেরই মেলা।"

"আমি ঠিক তেমন বুঝি না। সংসারে সকলেই পাপ করে না!"

"তুমি ভাব্‌ছ, রমা পাপ করে না। পাপ করার মতন শক্তি সাহস সকলের থাকে না, রমার নাই, তাই সে ভয় পেয়ে দোর দেয়।"

"কি বল্‌ছ তুমি?" ফটিকের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। মানদা হাসিয়া বলিল, "আমি দেখেছি ছাদের উপর থেকে,—কুকুরের মত চুপে চুপে গিয়ে তুমি দাঁড়ালে। অল্প দুটো চারটে কথা হ'লো, ছোট করে, শুনতে পাই নাই। দেখলাম রমা ভয় পেয়ে দোর দিল। না তাতে তুমি লজ্জিত হ'য়ো না। ওতে আমি একটুও রেগে যাই নাই। রমাকে

তুমি বিয়ে কর্ত্তে চেয়েছিলে, পাও নাই। তা বলে রমার উপর তোমায় টান যায় নাই। রমার এত সাহস নাই যে, তোমায় দখল দেয়। তা হোক্, রমা তোমার বুকে যে আগুন জ্বালিয়ে দেবে, আমি তা নিবিয়ে দেব। তাতে আমার রাগ বিদ্বেষ নাই। আমার এমন শাসন নাই যে, তুমি আর কারুদিকে চেও না। সহস্র জনের দিকে তুমি নিষ্ফল চাউনি চেয়ে এসো, আমি তাতে খুসী হবো, তোমার বুকে যত আগুন জ্বলে ততইত আমার ভাল, আমি একলাটী ব'সে সেই আগুন পোহাব।"

ফটিক স্পষ্ট ভাষায় বলিল, "প্রখর বুদ্ধিমতী তুমি বউদিদি! যথার্থ আমি রমাকে ভালবাসি।"

"তাতে আমার কোনও ক্ষতিই নাই। ফটিক, তুমি বড় ভয়ঙ্করে। আচ্ছা, আমি তোমার কোনও ভয়ই রাখ্‌বো না, ভয়ত তোমার বুড়ো নন্দকিশোরকে? আমিত ভাব্‌ছি, ও কাঁটাটা শীঘ্রই পথ থেকে সরিয়ে ফেল্‌বো, এতে আর বেশী কোনও পাপ হবে না। আজ না হয়, দুদিন পরে, বুড়োটার যাবার সময়ত হইয়েই এসেছে। দুদিন আগে একটু এগিয়ে দেওয়া! আর থেকেওত বড় কষ্ট পাচ্ছে! এমন সুন্দরী যুবতী রমণী ঘরে, ষাট বছরের জীর্ণদেহ নিয়ে কি কষ্ট পাচ্ছে, তা বুঝ্‌তে পার না?"

ফটিক শিহরিয়া উঠিল। বিস্মিত স্বরেই বলিল, "না না, ওকি কথা, নন্দবাবু তোমায় কত ভালবাসেন!"

মানদা হাসিয়াই বলিল, "তার ভালবাসায় আমার কি প্রয়োজন! সে ভালবেসেই ত আমায় এমনি করেছে! আমিত দালান কোঠা সোণা-মণির ভাবনা কখনও ভাবি নাই। আমিত কখনও আশা করি নাই যে, আমি খাটে শুয়ে থাক্‌বো, দাস দাসী আমার ভাতের থালা দোতলায় তুলে দেবে, আমায় জল তুলে স্নান করাইবে! আমি ভেবেছিলাম,

একটা চালা ঘরে হাতা বেড়ী, বাসনবাটী নিয়ে আমি থাক্‌বো। সেইত দয়া ক'রে, ভালবেসে এনে এই বিপদে আমায় ফেলেছে! ফটিক! তুমি আমায় বড় পাপী ভাব্‌ছ?—আমি এ রকম পাপী না হবার অনেক চেষ্টা করেছি, সংসারে সকলের কাছেই কাতরে কত অনুনয় করেছি, আমায় পাপের দিকে নিওনা। ফুলকে বলেছি, আমার সুমুখে ফুটো না, বাতাসকে বলেছি, অত মিষ্টি পরশে আমার গায়ে লেগো না, কোকিল শ্যামাকে বলেছি, আমার কাণের কাছ থেকে সরে গিয়ে ডাক। কেউত আমার কথা শুনে নাই। যা'ক, ওসব কথা তুল্‌তে গেলে প্রাণ শুকিয়ে আসে। এসো ফটিক বসো! রমার বাড়ী থেকে বড় জ্বালা নিয়ে এসেছ? না? ফটিক! আমার প্রাণের ফটিক?"

মানদা ফটিককে হাত ধরিয়া কাছে বসাইল। লীলা-নৃত্য পর চক্ষে চাহিল, তার পরে বলিল, "আর একটা কথা, নিমাই ছোঁড়া বড় হচ্ছে, আমাদের সুখের পথে কাঁটা হবে। ওকেই এই সময় সরিয়ে ফেলি! ওতেই বা কি এমন পাপ হবে! ওর জন্যত কাঁদবার কেউ থাক্‌বে না? কাঁদ্‌তে পারে রমা আর ললিত,—তাতেও আমার আনন্দ। তারপর এই বাড়ী, এই সম্পদ! তোমার আমার একছত্র অধিকার! সুখের পথে আমি কোনও কাঁটাই রাখ্‌বো না। এমনি যেদিন হবে, সেইদিনই ফটিক তুমি আমি ষোল আনা সুখে ডুবে থাক্‌বো। আর কিছুদিন সয়ে থাক। ফটিক বসিয়াছিল একটী বেঞ্চেরপরে, উঠিয়া দাঁড়াইল! কথা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে নন্দকিশোর আসিয়া সেখানে উপস্থিত। ফটিক অন্ধকারে লুকাইয়া গেল।

নন্দবাবু একটু রুষ্টস্বরেই বলিলেন, "কে গেল? ফটিক না।"

মানদা স্বচ্ছন্দে বলিল, "হ্যাঁ! ঠাকুরপোকে এখানে ডেকেই এনেছিলাম, লোকটা যে লাজুক, তোমাকে দেখে পালিয়ে গেল?"

"কেন? কেন? এখানে ডেকে এনেছিলে কেন? এই রাত্রিতে?" নন্দকিশোরের স্বর কাঁপিয়া গিয়াছিল?

"এনেছিলাম, দাদার বিয়েটার একটা কিছু কল্লে না। আপনার যা হবার তাত হলো, এখন বাপের বংশটাও থাক্‌বে না দেখ্‌ছি।"

"ফটিক তার কি কর্‌বে? রাত্রিকালে এমন নির্জ্জনে বসে! ছি ছি!"

"ও, তোমার সন্দেহ হচ্ছে বুঝি? ওমা আমি কোথায় যাবগো? এমন মন তোমার? আমার মরণই ভাল! তবে এখন যদি মরি, তোমার কি হবে তাই ভাবি। নইলে যার উপর স্বামীর এমন সন্দেহ, সে নারীর মরণই মঙ্গল। তোমার হাতে পড়ে সুখত এই হলো, এখন আবার কথায় বিষ ঢাল্‌তে লাগ্‌লে। আমি কি কচি খুকীটী যে, বাড়ীর চাকর ফটিকের সাথে একটা কথা বলেছি বলে তোমার সন্দেহ হলো।"

নন্দকিশোর শিষ্ট হইলেন, বলিলেন "না না, এমন কিছু নয়। তবে ফটিকের সঙ্গে কি কথাটা হচ্ছিল?"

"তাও শুন্‌বে? তা শোন, তুমি না শুন্‌লেত কাজ হবে না। ফটিক বল্‌ছিল কি, গৌরীকে জোর করে যদি আমরা দুলালের সাথে বিয়ে দেই তা রোধ কর্‌বে কে? তুমিইত এখন গৌরীর বিয়ের কর্ত্তা। ললিত এই ক'মাস কোথায় চলে গেছে, কি বল? এত বড় মেয়ে গৌরী ঘরে আইবুড় থাক্‌লো। কি বল? ফটিক কিন্তু মহাবুদ্ধিমান।"

মানদা আঁধারে হাসিল, কণ্ঠস্বরে তা বোঝা গেল। নন্দকিশোর বলিলেন "তাইত।"

"আচ্ছা, চল ঘরে, ঠাণ্ডা লাগিয়ে কাজ নেই, তোমারত শরীর ভাল নয়। ঘরে গিয়ে বসে ভেবে দেখো।"

নন্দকিশোরের হাত ধরিয়া মানদা ঘরে গেল।

ললিত সেদিন সেই মলিন-ছিন্ন-বেশে দ্রুত ছুটিয়া গিয়া একটা রাস্তার মোড়ে গিয়া দাঁড়াইল। সেখানে একটা গাছে ছায়া করিয়া রাস্তা ঢাকিয়া দিয়াছিল। ললিত ভাবিল, মন্দ নয, মুটে গিরিই করিব। সেই ছিন্ন বস্ত্রখানির অর্দ্ধেকটা ছিঁড়িয়া নিয়া ললিত গামছা করিল! তারপরে ভাবিল, কোনও চেনা লোক যদি চিনে ফেলে! আবার ভাবিল, জামা জুতা পরে চিনিয়ে দিতে গেলেত, অনেকে চিনিতে চায় নাই; এখন চিনিতে আসিবে কেন? ললিতের মনে তখন যেন বেশ স্ফুর্ত্তি আসিয়াছে! সে ভাবিতেছে, সে যা খাটি, তাই সে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধোয়া জামা কাপড় পরিয়া সে যখন রাস্তায় চলিয়াছে তখন তার পেট ক্ষুধায় জ্বলিয়া গিয়াছে, এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া খাইতে গেলে পয়সার ভাবনা আসিয়া পড়ে; যদি বা দুই একটী পয়সা বাঁচান যায়, তাদিয়ে মুড়ি বা বেগুনি ফুলুরি খাইতে লজ্জা করে। জামা জুতা পরিয়া ভদ্রলোক সাজিয়া রেস্তেঁরেতে বসিয়া চা, বিস্কুট, পরোটা মাংস খাওয়াই চলে, কিন্তু মুড়ি বেগুনি খাইতে দেখিলে যে লোকে হাসে। আজ যদি ললিত রাস্তায় বসে ডালপুরি ফুলুরি খায়, তবেত তা দেখে হাসিবার কেউ নাই। মানুষ খাটি ভাব ফুটিলে লজ্জা পায়, আর সত্যটা মিথ্যা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে এত ব্যস্ত!

তখনই একটী বাবু যাইতেছিলেন, একটী সুটকেশ হাতে ছিল। তিনি বলিলেন, "মোট লেগা।"

"বহুত আচ্ছা!" বলিয়া ললিত বাবুর ব্যাগটা লইয়া মাথায় করিল। বাবু বলিলেন, "কেতনা মাংতা, হাওড়া জানে হোগা।"

"এক সিকি দি জিয়ে বাবু।"

"নেই, নেই, দু'আনা দে'ঙ্গে।"

"বহুৎ আচ্ছা! চলিয়ে বাবু সাহেব।"

ব্যাগটা বেশী ভার ছিল না, ললিতের যাইতে বিশেষ কষ্ট হইল না। হাওড়ায় গিয়া সে দু আনা পাইল। বাবুকে বলিল কুছ্ বক্‌সিস বাবু!" ললিত অনেকবার দিয়াছে। তাই শিখেছে, মুটে ব্যবসায়ে এমনই চাহিতে হয়। তাই চাহিল, বাবুও দু'পয়সা দিলেন।

তখনই সে এক পয়সার ছাতু আর দু পয়সার কলা গুড় কিনিল। তাই শাল পাতায় করিয়া খাইয়া, গঙ্গায় গিয়া জল পান করিল। কলের জল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রেলের কুলির মধ্যে ঢুকিবার অধিকার তার নাই, হাওড়ার পুলের মুখে দাঁড়াইয়া সেদিন আরও দুটো মোট সে পাইল। আট আনা আয় হইল রাত্রি ১২টার মধ্যে। পরদিনই ললিত, একটা পুরাতন কাপড়ের দোকান হইতে কালো একটা বড় কোট কিনিয়া লইল। আর একখান নতুন গামছা কিনিয়া রাস্তার ধূলা জড়াইয়া ময়লা করিয়া লইল। ললিত এর আগে থেকে কয়দিনই পয়সার অভাবে ক্ষৌরী হইতে পায় নাই, এখন তার চুল দাড়ি রুক্ষ, সকল দিকেই তাকে কুলির মত দেখাইল। কিন্তু তার গায়ের বর্ণ যে গৌর, এখনও তার কান্তি শুকাইয়া যায় নাই। ললিত মাটীতে শুইত, গায়ের ধূলা মলা মুছিত না। চেনা লোক দেখিলে ললিত পাশ কাটিয়া দাঁড়াইত। ললিত একটা ষ্টিমার ঘাটে গিয়া মোট বহিতে লাগিল। তার দৈনিক আয় ২।৩ টাকা। নাম বদলাইয়া নাম রাখিল "লালু।" বাংলা বুলি ছাড়িয়া হিন্দি বুলি ধরিল।

ললিতের এতে বিশেষ অস্বস্তি বোধ হইল না। ললিত দেখিল, এ অন্ন সমস্যার বাজারে, ভট্টাচার্য্যের বংশধর, ডাইং, ক্লিনিংএর লেবেল

মারিয়া বসিয়াছেন, বসুরায় চৌধুরীর গ্রাজুয়েট পুত্র "বসু গ্রাজুয়েট্ সেভার" বলিয়া সাইনবোর্ড জাহির করিয়াছেন। ললিত না হয় গ্রাজুয়েট মুটে হইয়া একটা নূতন পথ আবিষ্কার করিল। এর পরে এ পথে আরও অনেককে আসিতে হইবে বলিয়া ললিতের বিশ্বাস হইল। ললিতকে কেহই চিনিতে আসিল না। এ ব্যবসায়ে চেনা পরিচয় ইণ্ট্রোডাক্‌সনের প্রয়োজন হয় না।

ললিত পনর দিনে ত্রিশ টাকা উপার্জ্জন করিল। পাঁচ টাকা খাইতে গেল। ২ টাকায় কাপড় গামছা ফতুয়া কিনিল। দশ টাকা বাড়ীতে পাঠাইল। তার পর ভাবিল, হোটেল গিন্নীর দেনাটা এই বেলা শোধ করিয়া আসি।

বেলা বারটা বাজিলে হোটেলে লোকের ভিড় থাকে না, ললিতও অত বেলায় কাজে বার হয় না। তখন অবসর বুঝিয়া ললিত সেই মুটিয়া বেশেই হোটেলে ঢুকিল, হোটেল গিন্নী দেখিয়া বলিল, "কি চাইরে বাপু! এখন এসেছিস্? এখন কি কিছু আছে। এত এত ভাত ছিল, একটু আগেই এলেই খেতে পেতিস্। এইত আমি ফেলে দিয়ে এলুম।"

ললিত আস্তে বলিল, "আমি মা, ললিত।" হোটেল গৃহিনী প্রখর দৃষ্টিতে চাহিল, "এঁ্যা? ললিত? কোন্ ললিত? সেই ললিত? তাইত, আহা! এমন সাজে তোমায় কে সাজাল?"

"তুমিইত সাজিয়েছ মা!"

বর্ষীয়সী রমণী চক্ষু অবনত করিল। তার বুকের ভিতর, অতি নিম্নে বহুদিনের বহু ঘটনার চাপে পিষ্ট মলিন হয়ে ছিল যে কোমল নারী-প্রকৃতি—তা যেন সহসা তাপস্পৃষ্ট তাপমান যন্ত্রের পারদের ন্যায় ভেসে উঠিতে চাইল, সেও লজ্জিত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "তা আবার এসেছ কেন?"

"এসেছি তোমার পাওনাটা দিয়ে যেতে, দেখত, আমার কাছে কত পাবে ?"

"তোমার টাকা হয়েছে ? কোথায় পেলে ?"

"আমার টাকার অভাব আর নাই ? তোমার কৃপায়, আমি আমার যোগ্য পথ চিনে নিয়েছি।"

"কি কর তুমি ? সাহেবের দরয়ানি।'

"না মা, এইত দেখ্ছ সাজ, তুমি বলে দিয়েছিলে, মুটেগিরি কর্ত্তে, আমি মুটেগিরি করি। কারু গোলামগিরি করি না। রোজ দু টাকা পাই। চার আনা আমার খেতে যায়। তুমি পথটা দেখিয়ে দিয়েছ মা, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।"

"ললিত!" প্রৌঢ়া রমণীর চক্ষে জল আসিল। সে চক্ষু মুছিয়া লইয়া বলিল, "ললিত, মনে আছে আমার সেদিনকার কথা। আমি তোমার বড় অপমানই৷ করেছিলাম, তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, তোমায় রাস্তার উপর দাঁড় করিয়ে, পরনের কাপড় কেড়ে নিয়েছিলাম, তোমার বিছানাপত্র আমি কেড়ে রেখেছি। তুমি এখন কোথায় থাক, কিসে শোও ?"

"আমি।থাকি রাস্তায় ফুট পাথে। মাটীতে শুলেই আমার ঘুম আসে। আমি যে তোমার কৃপায় আমার খাঁটি মূর্ত্তিটা ধর্তে পেরেছি।"

"আজ তোমার খাওয়া হয়েছে ?"

"হ্যাঁ! আমি ছাতু কলা আর দই খেয়েছি। রাত্রিতে ভাত রেঁধে খাই।"

"চল ললিত, উপরে যাই।" বলিয়া হোটেল গিন্নী ললিতের হাত ধরিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। সেখানে গিয়া ললিতকে তার খাটের উপর বসিতে বলিল, ললিত খাটে না বসিয়া নীচে বসিল। তখন

সেই রমণী তাকে একখানি ধোয়া ফরাস ডাঙ্গার ধূতি দিয়া বলিল, "এই কাপড়খানি তোমায় পরতেই হ'বে।" রমণীর চক্ষু বাহিয়া ধারা পড়িতেছে।

ললিত বলিল, "একি মা?"

"ললিত, তুমি আমায় মা বল কেন?"

তুমি আমার মায়ের বয়সী, তাই মা বলেছিলাম। তুমি আমায় আশ্রয় দিয়েছিলে, তাই মায়ের মত তোমায় ভেবেছিলাম। তুমি আমার সত্যিকার ওজনটা বুঝিয়ে দিয়ে, আমি সত্যি যেমন মানুষটী, তেমনি সাজিয়ে দিয়েছ, তাই মায়ের মতই তোমায় ভক্তি করি।"

"তবে আমি মা, আমার কথা রাখ, কাপড়খানি পর।"

ললিত তার মলিন গড়া ছাড়িয়া ধোয়া ধুতিখানি পারিল। কাপড় পরিতে তার কুলির কোর্টটা খুলিয়া রাখিতে হইল। তারপর একঘটি জল আনিয়া ললিতের পায়ে ঢালিয়া দিয়া, বৃদ্ধা তার পা ধোয়াইতে বসিল। ললিত পা সরাইয়া বলিল, "ছি মা, একি? সন্তানের পা মায়ের ছুতে হয়?"

"মা ইত ছেলের গা পা ধোইয়ে মানুষ করে।" বলিয়া ললিতের মাথায় খানিকটা সুগন্ধ তেল মাখাইল। তারপর বালতি পুরিয়া জল আনিয়া, সুগন্ধি সাবানে তার অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া দিয়া, গামছায় ভাল করিয়া মোছাইল। পরে আর একখানি রেশমী পা'ড়ে ধুতি আনিয়া তাকে পরিতে বলিয়া নীচে নামিয়া গেল। ললিত কিছু বুঝিতে না পারিয়া কলের পুতুলের মতন এই সব করিয়া গেল!

অল্পক্ষণ পরেই একথালা ক্ষীরমণ্ডা আনিয়া, ললিতের সম্মুখে রাখিয়া সে রমণী বলিল "খা বাছা, না বলিস্ না।"

ললিত না বলিতে পারিল না।

ললিতের খাওয়া শেষ হইলে, বৃদ্ধা তার সবগুলি বাক্সে পেটরা খুলিল, খুলিয়া ললিতকে সেগুলি দেখাইয়া বলিল, "বাবা! এই সবই তোর?" ললিতের বিস্ময়ের পর বিস্ময় বাড়িতেছে, এযে অনেক সম্পদ টাকা গিনি নোট অনেকগুলি, অনেকগুলি সোণার অলঙ্কার, বস্ত্র পরিচ্ছদ! ললিত কি বলিবে বুঝিতে পারিতেছে না। তখন সেই বৃদ্ধা রমণী ললিতের হাতখানি ধরিয়া বলিল, "ললিত, সারাজীবন ধর্ম্মবেচে এগুলি কিনেছি। তবু অর্থের লালসা আমার যায় নাই। এই ভাতের দোকান খুলে দিয়েছি। ফেন মিশিয়ে ডা'ল বাড়াই, পচা জিনিস সস্তায় কিনে, চড়া দরে বেচি। দু'আনা খেতে দিযে চা'র আনা আদায় করি। যার জন্য ভদ্রলোকের ছেলে তুমি, তোমায় আমি মুটে সাজিয়ে দিয়েছি! অথচ তুই আমায় মা বলে ডেকেছিস! এত ধন আমার ঘরে থাকতে, যে এমন মা বলে ডাকে তাকে পাঁচটী টাকার জন্য অপমান করে কাপড় কেড়ে রেখে তাড়িয়ে দিয়েছি! ললিত, একথা আমার প্রাণে জাগল্ কেন জান? তোমার মা ডাক শুনে! মাত আমায় অনেকেই ডাকে, আমার ঝি ডাকে বামন ডাকে, যে সব ভীখারীরা উচ্ছিষ্ট খেতে আসে তারাও ডাকে। এমন সত্যিকার প্রাণ দিয়েত এ পর্য্যন্ত কেউ মা ডাকে নাই। ললিত, সত্য তুমি ছেলে, আমি মা! বল বাবা, আমার এ সব তুমি গ্রহণ কর্ল্লে।"

ললিত কথা বলিতে পারিল না, বসিয়া রহিল। রমণী আবার বলিতে লাগিল, "ললিত, এ সব আমার পাপে অর্জ্জিত, তা সত্য! কিন্তু তাতে তুমি কুণ্ঠিত হয়ো না। পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়! এই আমার প্রায়শ্চিত্ত, তোমাকে দান করে, এ পাপের ভার হতে আমি মুক্ত হতে চাই। তুমি একবার বল, তুমি এসব গ্রহণ কর্ল্লে;"

ললিত বলিল, "হ্যা মা, আমি গ্রহণ কর্ল্লাম।"

"তবে দাও, তোমার ঐ টাকা হতে আমার আজ গোটা পঞ্চাশেক টাকা। না হয় আমার এই গলায় এই হার ছড়া রেখে দাও।" বলিয়া হার তাহার হাতে খুলিয়া সে ললিতের হাতে দিল। ললিতও বাক্স মধ্য হইতে টাকা তুলিয়া বৃদ্ধার হাতে দিল।

বৃদ্ধা টাকা লইয়া নীচের গিয়া ঝি চাকরগুলিকে ডাকিয়া উঠাইল। বলিল, "যা চল, বাজার কর্ত্তে হবে, সকাল সকাল। আজ একটা ফিষ্ট দিতে হবে।"

ললিত ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। আজ পনরদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটনি, তার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। এত বড় ভাবনাটা আর বহিতে পারিল না।

সেদিন সে হোটেলে সকলে মণ্ডা মিঠাই ফেলিয়া ছড়াইয়া খাইল, সকলেই বলিল, "এ কিসের জন্য ?"

হোটেলওয়ালী বলিল, "আমার এ ব্রতের এই উদ্যাপন। কাল থেকে আর এখানে হোটেল বস্‌বে না। যার দেনা থাকে, আমি চাই না, কারু পাওনা থাক্‌লে এসে নিয়ে যেও।"

(১৯)

বৈকালে নিমাইয়ের সঙ্গে গৌরী খেলিতেছিল। বেলা যায় তবু বাড়ী ফিরিতেছে না, রমা একলা থাকিয়া আর পারে না। সে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছে গৌরীকে সকাল সকাল ঘরে ফিরিতে। গৌরী বার বছরে পা দিয়াছে, এখন তার যেখানে সেখানে আলু থালু ভাবে বেড়ান উচিত না, রমা তা অনেক বার গৌরীকে বুঝাইয়া দিয়াছে।

তবু গৌরী বড় দুরন্ত মেয়ে, সে বুঝিতে চায় না, রমা তাকে এমন করিয়া আগলাইয়া রাখিতে চায় কেন? বার বছরে পা দিয়াছে, তার এমন কি হইয়াছে? পিসীমা যাই বলুক, গৌরী মাঝে মাঝে তার দাদুর কাছে গিয়া, তার দুটো ফষ্টি তামাসার কথা না শুনেই পারে না। আর সকলে ঝগড়া ঝাটি যাই করুক না, দাদু গৌরীকে যে খুবই ভালবাসেন; তা গৌরীকে অস্বীকার করাইতে কেউ পারে না। দাদু এখনও তাকে কত সন্দেশ বাতাসা খেতে দেন। এখনও গৌরী না হ'লে আর কারুদ্বারা তার মাথা আঁচড়ান হয় না। তার পিঠে কুসকুড়ি কাটিতে গৌরী যেমন পারে, আর কেউ তেমন পারে না।

আজ নন্দবাবু গৌরীকে উপরে ডাকিয়া নিয়ে একখানি সুন্দর জরিপেড়ে রেশমী সাড়ী পরিতে দিয়াছেন। গৌরী সাড়ীখানি একবার পরিয়া আবার খুলিয়া রাখিতে যাইতেছিল, "মা দাদু, এ পরতে লজ্জা করে। এযে বিয়ের সময়ে পরে।"

দাদু বলিলেন, "তোরও ত বিয়ে।"

"ইস্। অমন দুষ্টুমি করোনা কিন্তু বল্‌ছি দাদু!"

"সত্যই আজ তোর বিয়ে গৌরী!"

গৌরী দেখিল, দাদু আজ তেমন হাসিয়া কথা বলিতেছেন না। এসব তামাসার কথা ত তিনি কত হেসে হেসে বলেন। আজ তার মুখ এত ভার ভার কেন? দিদিমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে নাকি? দিদিমণি ঝগড়া করে করে দাদুকে একেবারে জ্বালাতন করিল! "দাদু, এখন বাড়ী যাই, পিসীমা রাগ কচ্ছে। এ সাড়ীখানা তোমার বাক্স মধ্যে থাক, যে দিন ও পাড়ায় নেমন্তন্ন খেতে যাব, সেই দিন এসে চুপে চুপে পরবো। সকলে দেখে অবাক হবে, গৌরী এমন সাড়ী পেলে কোথায়? দাদু! তুমি আমার কাকামণির উপর এত চটে গেলে কেন?" তখন আর

এক ঘরে উলু পড়িল। "ও কি দাদু! উলু দেয় কারা?" বলিয়া গৌরীর সেই দিকে পা বাড়াইল। নন্দকিশোর গৌরীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "আজ এ বাড়ীতে একটা বিয়ে আছে, দেখ্‌বি এখন।"

"বিয়ে! কার বিয়ে?"

"দুলালের।"

"দুলাল দাদার? দুলাল দাদা বর সেজে বিয়ে কর্ত্তে যাবে? বড় মজা হবে, দুলাল দাদা যখন শ্বশুর বাড়ী গিয়ে বলবে, কাপড়কে কাপল কোটকে কোত্‌, ঘটিকে ঘতি, গাড়ুকে গালু। দুলাল দাদার বউ শুনে কি বল্‌বে দাদু?"

নন্দকিশোর তখন তাঁর গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "শোন গৌরী! এখন আর তামাসা নয়। আজ তোমাকেই আমি দুলালের সঙ্গে বিবাহ দেব। এই দেখ এতগুলি গয়না তোমার জন্য গড়িয়েছি। বাড়াবাড়ি কিছু করো না।"

নন্দকিশোরের কথার চেয়ে তার মূর্ত্তিখানাই গৌরী ভয়ঙ্কর দেখিল। সে কি বলিবে, কি করিবে, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিবে কি না,—কিছুই ভাবিয়া পাইল না। নন্দকিশোরের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

তখন মানদা আসিয়া গৌরীর গায়ে অলঙ্কার পরাইতে লাগিল। গৌরী যেন নিস্পন্দ কাঠের পুতুল! পরিচারিকা বলিল, "তা ত হবেই, এত গুণ সোণা, এ দেখ্‌লে কার মন না ভোলে। মেয়ে রাজি হয়ে গেছে।"

অলঙ্কার পরাইয়া সকলে উলুধ্বনি করিল। বালিকা গৌরীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সে নন্দকিশোরের পায়ের উপর লুটিয়া পড়িল, "দাদু! দাদু! এত বড় নির্দ্দয় ত তুমি হতে পার না! তুমি আমায় কত ভালবাস!"

মানদা বলিল, "ওগো নাতিকে একটু ভালবাসা ঢেলে বুঝিয়ে দাও না, যাকে ভালবাসতে হয়, তাকে হয় নিজের বউ কর্ত্তে হয়, না হয় শালা বউ কর্ত্তে হয়।"

নন্দকিশোর সেই কথাই বলিলেন, তোমায় ভালবাসি বলেই ত এমনি কর্ত্তে যাচ্ছি। সুন্দর গৌর পুরুষ দুলাল, নবীন যুবক। এই হাজার টাকার অলঙ্কার! এর চেয়ে ভালবাসা তুমি আর কোথায় পাবে?"

"ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার কাকাবাবু বাড়ী আসতে সময় দাও। দাদু! ছাড় আমায়, আমার পিসিমার কাছে যাই।"

"কেন এমন কচ্ছ গৌরী! দুলাল সুন্দর বর। আর এদের সকলের ইচ্ছা, আমি কি কর্ত্তে পারি?"

তখনই আলু থালু বেশে, আলুলায়িতকেশে রমা আসিয়া সেখানে উপস্থিত! সে কারু বাধা মানে নাই, কারু কথা শোনে নাই। তীব্র স্বরে সকলকে চমকিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "কাকা! কাকা! এ কি কচ্ছ? গৌরী যে তোমার বড় আদরের, তাকে এমনি ভাবে বলি দিতে যাচ্ছ কেন? আমরা অপরাধ করে থাকি, আমাদের শাসন কর,—গৌরী ত কোনও অপরাধ করে নাই। গৌরীর মা বাবা তোমার কাছে কোনও অপরাধ করে যায় নাই"

নন্দকিশোর যেন কেমন হইয়া গেলেন। মানদা বলিল, "এসেছ—ভালই হয়েছে। শান্তশিষ্ট হয়ে হাসি মুখে ভাইঝিটী সম্প্রদান কর। তোমার ভাই ত বলেছিল, আমার ভাই বানর, আর তোমাদের ভাইঝি রত্নহার। পোড়া রত্নহার সেই বানরের গলে ছাড়া আর কোথাও উঠ্‌লো না। দাও, একবার হুলুধ্বনি দাও।"

নন্দকিশোর মানদার কথা শুন্‌লে বল পান। তিনি বলিলেন, "রমা!

আমি এমন মন্দ কিছু কচ্ছি না। বংশে এত বড় মেয়েটা আইবুড় রেখে, আমি ত নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না। তাই এমন হলো। মন্দ কি হলো? গৌরীর মন্দ হলো না।"

রমা গৌরীকে জড়াইয়া ধরিল, তার পর বলিল, "চল গৌরী, বাড়ী চল্।"

মানদা পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। দুইজন পরিচারিকা ও মাতঙ্গী গৌরীকে ছিনাইয়া লইল। গৌরী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল! রমাও চীৎকার করিয়া বলিল, "কাকা! গৌরীকে আমায় দেবে কি না?"

নন্দকিশোর কথা বলিলেন না। মাতঙ্গী বলিলেন, "নাগো, না; আমার দুলাল বানর! অমন মুখে ঝঁ্যাটা বিধিঁয়ে দেই নি, তাই ভাগ্যি।"

রমা আবার বলিল, "গৌরীকে দেবে না কাকা?"

মাতঙ্গী আবার বলিল, "না, না, না।"

রমা আরও উচ্চ করিয়া বলিল, "কাকা! আমি তোমার কাছে জানতে চাই, গৌরীকে দেবে না?"

নন্দকিশোর বলিলেন, "আমি আর কি করি? বিয়েটা হয়ে যাক রমা।"

রমা আর কাঁদিল না, চক্ষুর জল ফিরাইয়াছিল। উন্মত্ত কণ্ঠে কহিল,—"নন্দকিশোর! নন্দকিশোর! তুমি মরেছ! এ তোমার প্রেতাত্মা! কিন্তু রমা বেঁচে থাকতে গৌরীকে জীবন্ত তোমরা পাবে না, এ আমার প্রতিজ্ঞা!"

বিদ্যুতের মত রমা ছুটিয়া বাহির হইল।

পথে যাইতে রমা দেখিল, ফটিক বড় ব্যস্ত হইয়া কোথায় ছুটিতেছে! রমা তার সম্মুখে পথ আটকাইয়া বলিল "দাঁড়াও একটু, এত ব্যস্তে কোথায় যাচ্ছ?" "যাচ্ছি পুরোত ডাক্‌তে, বাবুর বাড়ী বিয়ে তা জান?"

"ফটিক! আজ একটা উপকার তোমায় কর্ত্তে হবে! কোনও দিন কিছু তোমার কাছে চাই নাই,—আজ আমার বড় দায়।"

"তোমার দায়, আমার কি লাভ?"

"এতে লাভ চাও, প্রতিদান চাও, আমি দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এত হীন ত তুমি নও ফটিক।"

ফটিক ক্ষণকাল নীরব রহিল, কি ভাবিল। তখন সন্ধ্যাকাল। রমা তার বিবাহের পর আর কোনও দিন এমন সময়ে এমন ভাবে উঁচুমুখে দাঁড়ায় নাই, এমন স্পষ্ট ভাষায় কথা বলে নাই। ফটিক বলিল, "একটা কাজ কর্ত্তে হবে?"

"কি।"

"আমার সঙ্গে আমার বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে হবে, পার্‌বে?"

"কেন পারব না? চল।"

"আমি যে লম্পট, তোমার ভয় হবে না।"

"অন্যের কাছে তুমি লম্পট হ'তে পার, আমার কাছে নও।"

"শুধু তা নয়, তোমাকে কুলটার অভিনয় কর্ত্তে হ'বে। পারবে রমা? তুমি যে বড় লজ্জাশীলা।"

"সব পারব, গৌরীকে উদ্ধার কর্ত্তে আমি সব পারব।"

"তবে চল।" বলিয়া ফটিক আগে আগে চলিল, রমা সেই অন্ধকারে তার অনুগমন করিল।

ফটিকের বাড়ীর কাছে গিয়া শুনিল, খুব বাগু বাজনা হইতেছে। দুলাল সেই বাড়ী হইতে শোভা যাত্রা করিয়া পাল্কি চড়িয়া বিবাহ করিতে যাইবে। ফটিক রমাকে একটা বৃক্ষের আড়ালে বসাইয়া রাখিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া দুলালকে ডাকিয়া, সেই বৃক্ষমূলে লইয়া আসিল। ফটিক দুলালকে বলিল, "দুলাল। তুই যে একটা ভয়ঙ্কর কাজ করে ফেল্‌ছিস্,—এতদূর আগে করে নিয়েছ তা ত জানি না। এখন উপায় ?"

"কি দাদা ?" বলিয়া দুলাল ফটিকের মুখের কাছে আসিল। আঁধারে তার ভয়ও করিতেছিল। বিশেষ বিয়ের নাওয়া নেয়ে সে চন্দন কাজল পরেছে, এমন দিনে ভূত প্রেতের, পরীর ভয় আছে বলে সে অনেকের কাছে শুনেছে।

ফটিক বলিল, "তুমি রমাকে বিধবা-বিবাহ কর্ত্তে চেয়েছিলে ?"

"তাত চাইছিলাম, পত্তর ত তোমায় দেখিয়ে তবে দিয়েছিলাম। সে তা মান্‌লে কই ?"

"মান্‌লে না ? সে কি না বলে জবাব দিয়েছিল।"

"না মোতেই জবাব দেয় নাই।"

"তবেই ত মৌনম্ সম্মতি লক্ষণম্।" তুমি গাধা, তুমি তা বুঝবে কি ? তুমি বিধবা বিয়ে করে সমাজ উদ্ধারের দৃষ্টান্ত দেখাবে, তা না করে এই বালিকা বিবাহ ক'রে দেশের কুসংস্কার আরও বাড়াতে যাচ্ছ।"

"তা ভাই বিধবা ত পেলাম না।"

"এখন যদি রমাকে পাও ?"

"তবে এ বিয়ে করে কোন্ শ্যালা।"

"তবে ঐ দেখ, গাছের আড়ালে চেয়ে।"

ফটিকের হাতে দেশালাই বাতি ছিল। জ্বালিয়া দেখাইল রমা অবগুণ্ঠণে মুখ ঢাকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আবার বাতি নিবাইয়া বলিল, "রমা কি করেছে জান ? স্ত্রীলোক হয়ে লজ্জামান বিসর্জ্জন দিয়ে প্রেমের মান রেখেছে। আমি পর পুরুষ, তবে তোমার বন্ধু জেনে, আমার পা ধরে বলেছে, দুলাল যদি তার না হয় তবে সে গলায় দড়ি দিয়ে প্রাণ ত্যাগ কর্‌বে। দুলাল যদি গৌরীকে বিয়ে করে, তবে সে হ'বে সম্বন্ধে শাশুড়ী ! যাকে প্রাণ দিয়েছে, তাকে তার শাশুড়ী হতে হবে, সে প্রতিজ্ঞা করেছে, তার আগেই সে প্রাণত্যাগ কর্‌বে। তাই তোমার সঙ্গে একবার সে দেখা কর্ত্তে এই পর্য্যন্ত ছুটে এসেছে ! এখন তোমার যেমন ইচ্ছা।"

দুলাল বলিল, "তবে আমি এখন কি করি দাদা ?„

"কি আর করবে, এখনই ঐ রমাকে নিয়ে কলকাতায় চম্পট দাও—এই ত আর আধ ঘণ্টা পরে গাড়ি। এই নাও ভাড়া। চল আমি টিকেট করে দিয়ে আস্‌ব।"

দুলাল বিনা তর্কে তাহাই করিল। রমাকে লইয়া ফটিকের সাথে রেল ষ্টেশনের দিকে দ্রুত পদেই চলিল।

লগ্ন সরিয়া যায়, বর আসিতেছে না, ভাবিয়া বিবাহ বাড়ীর সকলে যখন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, তখন ফটিক আসিয়া খবর দিল, দুলাল রমাকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। সে গৌরীকে বিবাহ করিবে না, রমাকে বিধবা বিবাহ করিবে। সংবাদ শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল।

নন্দকিশোর বড় অস্থির হইলেন। তাঁহার দয়া ধর্ম্ম, বিষয় জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু বংশমর্য্যাদার জ্ঞানটা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহারই বংশের কন্যা, তাহারই ভ্রাতুষ্পুত্রী বিধবা রমা কুলত্যাগিনী হইয়া গৃহের বাহির হইল! সমাজে তাহার দুরপণেয় কলঙ্ক হইল! দুলাল এত বড় পাষণ্ড! নন্দকিশোর, কি করা যায় ভাবিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কার্য্যশক্তি, চিন্তাশক্তি কিছু মাত্রও নাই। পিতৃপিতামহের মান গেল, সমাজে মুখ রাখিবার স্থান রহিল না! নন্দকিশোর বড় আক্ষেপে বলিলেন, "হায়! হায়! আমি বিষ খাব, না গলায় ফাঁসী দেব?"

দলিত বিষধরীর ন্যায় মানদা অন্তরস্থ বিষে ফুলিয়া উঠিল! এত বড় হতমান যে আর কখনও ত হয় নাই। এই ক'টা বছরের মধ্যে, এত বড় বড় পাপের অনুষ্ঠান সে করিয়াছে, কোথাও সামান্য মাত্র আঘাত বাধা সে পায় নাই! রমা যে মূর্খ দুলালকে ভুলাইয়া এই করিয়াছে, তা সেও বুঝিয়াছে, আর সকলেও বুঝিয়াছে। রমা তা হ'লে মানদার চেয়েও চতুরা বুদ্ধিমতী? এ চিন্তায় মানদার অন্তরের বিষ, ফুলিয়া ফুলিয়া, বন্যায় তরঙ্গের মত তার অন্তস্থল আলোড়িত করিতে লাগিল! উত্তেজিত বিষ কোথাও ঢালিতে না পারিলে সাপিনী বাঁচে না। মানদা মনে মনে বলিল, "আর না। আর দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই। সংসার আমার পরে একটুও দয়া দেখায় নাই, আমিও সংসারের পরে একটুও দয়া দেখাইব না। আমার এত বড় সুখের নেশা, এমন অনুপম রূপ যৌবন! এর সার্থকতা সংসারে, সমাজে আমাকে দিল না। আমিও সংসারে এমন কিছু করে যাব, যা দেখে চন্দ্র সূর্য্য অনল পবন স্তম্ভিত হয়ে যাবে!"

মানদা গৌরীকে গিয়া বলিল, "ওলো গৌরী' শুন্‌লিত তোর পিসীর

কাণ্ড, তোর বর নিয়ে সে ভেগে পড়েছে।" গৌরী কোনও কথাই বলিল না। তার বলিবার কিছু ছিল না। সে এতক্ষণ বিপদে পড়ে কেবল হরিনামই করিতেছিল। এই ব্যাপার শুনে বুঝিল হরিই দয়া করিয়াছেন। তাই আরও ভক্তিভরে সে হরিনাম জপই করিতেছিল। মানদা আবার বলিল, "এখন যা লো যা, তুইও তোর পিসীর বর নিয়ে সড়ে পর! তোর পিসির বর কে জানিস্? ঐ ফটিক! যা, হারাম-জাতি, বের হ' এখন থেকে।"

গৌরী একটুও বিলম্ব না করিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া নামিয়া আসিল। কেউ তাহাকে বাধা দিল না। নীচে আসিয়াই সেই অন্ধকারের মধ্যে ছুট দিল।

পরক্ষণেই মানদা ভাবিল, "একি করিলাম! গৌরীকে যেতে দিলাম যে! আমি যে ভেবে এসেছি, ছুঁড়ীকে একটা আবর্জ্জনার মত এই ছাদ থেকে ছুড়ে ফেলে দেব। হাড় গোড় ভেঙ্গে মরে থাক্‌বে। রমা যার জন্ত এত করেছে, এসে দেখ্‌বে—তার মরা নিয়ে সরকারী ডাক্তারখানায় পরীক্ষা কচ্ছে! আঃ! ভারি ত অন্যায় হলো!"

গৌরী ছুটিয়া যাইতে তাকে সে দেখিল ফটিক। ফটিক গিয়া তাকে ধরিল, "কোথা যাও গৌরী এ অন্ধকারে?"

গৌরী ফটিককে জড়াইয়া ধরিল, "বলিল ফটিক দাদা! আমার পিসীমা কোথায়?"

"সে দুলালকে বিয়ে কর্ত্তে কল্‌কাতায় চলে গেছে।"

"না, সত্যি ফটিক দাদা, আমার পিসিমার কাছে নিয়ে দাও।"

ফটিক একটু ভাবিয়া বলিল, "আয় তবে আমার সাথে।" ফটিকের হাত ধরিয়া গৌরী চলিল। অনেক দৃঢ় অন্ধকারে গ্রামের আঁকা

বাঁকা রাস্তা ভাঙ্গিয়া চলিল। তখন রাত্রি অনেক, অন্ধকার বড় ঘন হইয়া উঠিয়াছে, কিছুই চক্ষে দেখায় না। গৌরীর কান্না আসিতে লাগিল, তবু সে হরিনাম করিতে করিতে চলিল।

সে গ্রাম ছাড়িয়া আর একটা গ্রামের একটা চালা ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া ফটিক ডাকিল, "জমির! জমির! ওঠ ত।"

একজন কাল যোয়ান মুসলমান দ্বার খুলিয়া দীপ জ্বালাইয়া বাহিরে আসিল। ফটিক বলিল, "এই মেয়েটীকে তোর বাড়ীতে দিন কয়েক সেরে রাখতে হবে। এ ললিতের ভাইঝি গৌরী! দেখিস কেউ যেন টের না পায়।"

জমির যেন বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়াই বলিল "সে কি! ললিতবাবু ভদ্রলোক! তার ভাই ঝি এত রাত্রিতে।"

"সে সব ওর কাছে শুনবি। আর দেখিস গৌরী, যদি বাঁচতে চাস ত, এখানে চুপ করে থাকবি,—কোনও সাড়া শব্দ কাঁদা-কাটা করিস্ না। নইলে বুঝতে ত পাচ্ছ। আমি তোর পিসিমাকে খুঁজে আনতে যাই।"

ফটিক চলিয়া গেল, জমির গৌরীকে ঘরে নিয়া তার স্ত্রীর কাছে দিল। তার কাছে সকল বৃত্তান্ত শুনিল।

তখন ফটিকের স্কন্ধে আবার শয়তান আসিয়া চাপিয়াছে। ফটিক যখন তার ছোট বংশে জন্মিয়াও বিদ্যালয়ে মেধাবী বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাতি পাইল, তখন গ্রামের যারা প্রধান, তারা বলিতেন, ফটিক গোবরে পদ্মফুল। পদ্মফুল কথাটা শুনিয়া ফটিকের মনে যেমন আনন্দ হইত, তার মূল গোবরে, এ কথাটায় আবার তেমনি জ্বালা হইত। তার সঙ্কল্প হইয়াছিল, এই গোবরের গন্ধটা সে তুলিয়া ফেলিবেই। তার পর তাকে কর্ম্মজীবনের পথে বড় দমাইয়া ছিল, সমাজের প্রধান এই নন্দকিশোরের

আর ললিত। সে বুঝিতে পারিল না, এত দরিদ্রের ঘরের মেয়ে রমা, সে তার কিসে অযোগ্য হইল। তার অর্থ সম্পদ বিদ্যা বুদ্ধি যা আছে, তাতে তাহার অন্ন বস্ত্রের অভাব ত ছিলই না। রূপগুণে সে এমন কিছু খাটোত নাই-ই। তখন শয়তান আসিয়া, সমাজের উপর বিদ্বেষ বহ্নিটা তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে ঢুকাইয়া দিল। সেই সময়ে নন্দকিশোর মানদা একত্র হইয়াই তাকে ডাকিয়া লইল! সেই সুযোগে ফটিক একবারে শয়তানের করায়ত্ত হইয়া পড়িল। তথাপি শিক্ষা, সভ্যতা, মনুষ্যত্বের আলোকটা তার একবারে নিবিয়া গেল না। ফটিকের কাছে কেহ উপকার চাহিলে সে তাকে ফিরাইয়া দিত না। কিন্তু তার ভিতর দিয়া যদি শয়তানের খেলা কিছু খেলিয়া লইতে পারিত, তাহা সে করিত। রমা যখন তার কাছে উপকার চাহিয়াছিল, তখন অহঙ্কারে তার বুক ফুলিয়া উঠিয়াছিল। রমা বুকের রক্ত চাহিলেও সে দিতে পারে তার জন্য সে কোনও প্রতিদান না পায়, নাই বা পাইল। সে যে উপকার দিয়া রমাকে, সুতরাং ললিত নন্দকিশোর সকলকেই ছোট করিতে পারিল, এই তার যথেষ্ট।

গৌরীকে দুলালের হাত হইতে রক্ষা করিতে গিয়া শয়তান তাকে বুদ্ধি দিয়াছিল! রমা দুলালকে গাড়ীতে চড়াইয়া দিয়া, শয়তান তার মনে গৌরবের আমল গড়িয়াই হাকিয়া উঠিল। ভাল হইল, ললিতের বোন রমা কুলটা হইয়া ঘরের বাহির হইল, আর কি সমাজে নন্দকিশোর বা ললিত মাথা তুলিতে পারিবে? হয় ত, এই সুযোগে সে রমাকে পাইলেও পাইতে পারে। মূর্খ দুলালের সাধ্য কি যে, রমার মত আগুন স্পর্শ করিতে পারিবে। রমা তাকে ভালবাসে, তা সে জানে। কেবল সমাজের ভয়ে,—রমা তার আয়ত্ত হইতেছে না। ধর্ম্মভয় বলে যে মানুষের একটী ভয়ের নাম আছে, তা ফটিক কখনও বিশ্বাস করিত না। রমার স্কন্ধে যখন সে কলঙ্ক আসিয়া চাপিল, তখন আর রমা কিসের জন্য

তাকে ভালবাসিয়াও উপেক্ষা করিবে! সুতরাং রমার সঙ্গে বিধবা বিবাহটা তারই হইতে পারে।

তার পর গৌরীকেও সে হাতে পাইল। এমনি সুন্দরী সরলা বালিকা গৌরী, তার ত্রস্ত কাতর ভাবে ফটিকের দয়া হইল। গৌরীকে স্থানান্তর করিতে না পারিলে তার উদ্ধার নাই। দুলাল রমার দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া কালই ফিরিয়া আসিবে। সুতরাং গৌরীকে কোনও প্রচ্ছন্ন স্থানে রাখিয়া, হিংস্র নন্দকিশোর ও মানদার হাত হইতে বাঁচাইতেই হইবে। তবে গৌরীকে যদি কোনও ভদ্রলোকের আশ্রয়ে না রাখিয়া বিধর্ম্মী বিজাতি মুসলমানের আশ্রয়ে রাখা যায় তাহাতে ললিত নন্দকিশোরের বংশে আর একটী কলঙ্ক রটিবে। তখন গৌরীকে সে তার মত কোন ছোট বংশের সৎপাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়া দিবে। বড় বংশের কেহ আর গৌরীকে গ্রহণ করিবে না। তখন ত ললিত নন্দকিশোর কি তাদের বংশের কেহ আর সমাজে মুখ তুলিয়া চলিতে পারিবে না। তাই শয়তানের উপাসক ফটিক গৌরীকে মুসলমানের ঘরে নিয়া রাখিল।

কিন্তু এখন রমার অনুসন্ধান না করিয়া ফটিকের মন স্থির থাকিতে পারিতেছে না? রমা বুদ্ধিমতী, দুলাল মূর্খ! রমা অবশ্য দুলালের হাত এড়াইয়াছে! কিন্তু পল্লী-কুটীরের যুবতী, কলিকাতায় কোথায় আশ্রয় লইবে? রমা তার ভাই ললিতের ঠিকানা অবশ্য জানে। কিন্তু সেখানে কি এ কালা মুখ দেখাইতে রমা যাইতে পারিবে।

এখন রমার অনুসন্ধান করা ফটিকের একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল! তাহার বড় আশা, এখনও রমাকে পাইলে সে সাধের নিকুঞ্জ রচনা করিতে পারে।

সঙ্কল্পে ব্যর্থ হইয়া মানদা আহত বিষধরী ফণিণীর ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া অন্তরে বিষ উথলিয়া তুলিতে লাগিল। সে যে ভাবিয়াছিল,—ললিতের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে হস্তিমূর্খ দুলালের সঙ্গে বিবাহ দিতে পারিলে, ললিতের উপর তাহার বড় রকম প্রতিহিংসাই লওয়া হইবে। গৌরীও তাহারই মত একটী নিরপরাধী সরলা বালিকা,—সে কথা একবার তাহার মনে উঠিয়াছিল, কিন্তু তা বলিয়া তাহার প্রতি অনুকম্পা দেখাইবার অবসর তাহার নাই। সে যে বিষের উপর বিষ ঢালিতে কৃতসঙ্কল্প। স্বজাতি বিজাতি, আপনার তাহার কেহই নাই। সে দেখিতে চায়, অপাত্রে সমর্পিত গৌরীর ম্লান মুখ। আর সেই ম্লান মুখ দর্শনে ললিতের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ, দীর্ঘশ্বাস। এই দারুণ তাপে ললিতের চিতা-দগ্ধ-শবের ন্যায় অতি ভয়ানক কালিমা মূর্ত্তি। হয় ত এই আঘাতে ললিত ক্রোধান্ধ হইয়া নন্দকিশোরের শিরে লাঠি মারিবে, নন্দকিশোর সেই আঘাতে পঞ্চত্ব পাইবে, ললিতকে খুনের অপরাধে পুলিসে ধরিয়া নিয়া ফাঁসী কাঠে ঝুলাইবে! রমা বুক-ফাটা শোকে চীৎকার করিয়া সমস্ত গ্রামটা উত্যক্ত করিয়া তুলিবে! তাই দেখিয়া তাহার মা মাতঙ্গী অট্টহাসি হাসিয়া করতালি দিয়া নৃত্য করিবে। কত কল্পনা যে করিয়াছিল মানদা! কে তাহা এমন করিয়া ব্যর্থ করিয়া দিল?

তখনও মানদার চিন্তাশক্তি সতেজ রহিয়াছে। মানদা চিন্তা করিয়া দেখিল, ইহার মধ্যে ফটিকের কোনও কারসাজে থাকিতে পারে। চিন্তা মাত্র ফটিককে ডাকিয়া পাঠাইল।

ফটিক আসিল, কিন্তু বড় ব্যস্ত সে। সে কাপড় চোপড় পরিয়া কলিকাতায় যাইবে বলিয়া বাহির হইয়াছে, রমাও দুলালকে অনুসন্ধান করিতে যাইবে। গাড়ির আর বিলম্ব নাই,—এখনই যাইতে হইবে।

মানদা বলিল, "ফটিক, দাদা দুলালচাঁদ রমাকে নিয়া পালিয়েছে ?"

ফটিক বলিল, অতি সংক্ষেপে, "হঁ্যা !"

মানদা ফটিকের হাত ধরিয়া বলিল, "তবে চল আমরাও পালাই ! চল, আজই এক্ষণে !"

"কি বল্‌ছ তুমি ?"

"সত্যি বল্‌ছি, এই দেখ বাক্‌স পোরা গয়না, টাকা নোট, পঞ্চাশ হাজারের কম হবে না। চল, তুমি আমি নিয়া পালাই ! নন্দকিশোরের বংশ উজ্জ্বল করে দিয়ে চল, আর বিলম্ব কেন ?"

"না, আজ থাক।"

"আজ থাক্‌বে কেন ? রমাকে একবার খুঁজে দেখতে চাও পাও কি না ? রমাকে পেলে আমাকে চাও না, কেমন ত ?"

ফটিক মানদার বিকৃত মুখভঙ্গি বিকৃত হাসি দেখিয়া চমকিত হইল, তাহার মুখপানে তাকাইয়া রহিল ! মানদা এবার গর্জ্জিয়া বলিল, "ফটিক,—তুমিই চক্রান্ত করে দুলালকে পালিয়ে দিয়েছ, গৌরীকে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছ। কেমন তাই নয় কি ?"

ফটিক বলিল, "হঁ্যা !"

"কেন ?"

"রমার অনুরোধে।"

"রমার অনুরোধ, আমার বিরোধকে তুমি একটু গ্রাহ্য কর্‌লে না ?"

"রমার অনুরোধে বিশ্বের বিরোধ গ্রাহ্য করি না।"

"তা হলে তুমি আমায় ভালবাস না ফটিক ?"

"না।"

"আমি তোমায় ভালবাসি বলে বিশ্বাস কর?"

"না, তাও করি না।"

"তুমি যে আমার অনেক খেয়েছ, অনেক নিয়েছ?"

"তুমি দিয়েছ, তাই নিয়েছি?"

"আমার উপর তোমার কোনও আশা ভরসা নাই?"

"কিছুই না।"

"ফটিক! তোমার মত মানুষও পুরুষের মধ্যে আছে? এত নিষ্ঠুর এত কঠোর, এত সাবধান, এত বুদ্ধিমান পুরুষের মধ্যে থাকতে পারে সে বিশ্বাস ত আমার ছিল না। আচ্ছা ফটিক! আমি কি সুন্দরী নই?"

"অনুপম সুন্দরী তুমি, কিন্তু যা থাক্‌লে নারীর রূপ পুরুষের মন ভুলাতে পারে, মন্ত্রশক্তির মতন কাজ করে, তা তোমাতে নাই।"

"সেই অকপট প্রেম? তাও কি আমাতে ছিল না? ছিল ফটিক, তাও ছিল, সে যে তোমরা থাক্‌তে দাও নাই। ফটিক! বড় স্পর্দ্ধা তোমার, যে তুমি আমায় এমন ভাবে বকিয়ে গেলে!"

ফটিক বাক্যব্যয় না করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। মানদা ডাকিয়া ফিরাইল। এবার মানদা কণ্ঠস্বর বড় কোমল করিয়া বলিল, "ফটিক, যাবে, একটু দাঁড়াও! হয়ত আর তুমি আস্‌বে না, আর আমায় মুখ দেখাবে না। রমাকে নিয়েই মজে থাক্‌বে। থেকো আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সুখে থাকো। তবে একটু বোসো, জন্মের মতন তোমার একটি-বার মিষ্টিমুখ করে দেই।"

মানদা মিষ্টান্ন সাজাইয়া আনিতে অন্ত ঘরে যাইতেছিল। ফটিক বলিল, "না না, আজ আর মিষ্টি মুখ করবো না।"

ষ্টেশনে গাড়ী থামিবামাত্রই রমা মেয়ে-গাড়ী হইতে নামিয়া, লুকাইয়া গেল। দুলালের সতর্ক দৃষ্টিতে তা ধরিতে পারিল না। রমার বড় দরকার, এখনই গিয়া ললিতের কাছে এই ভয়াবহ খবর দিবে। ললিতের ঠিকানা সে জানিত। কিন্তু কেমন করিয়া চিনিয়া যাইবে। রমা আরও দুই একবার, তার আগেকার কাকীমা থাকিতে, নন্দকিশো-রের কলিকাতার বড়ীতে আসিয়াছে। কলিকাতার ব্যাপার সে মোটা মুটি জানে। এক খানা ট্যাক্‌সীতে চড়িয়া বলিল, বিডন ষ্ট্রীট্ ফুল বাগানে যাইব।

বাড়ীর দরজায় গিয়া রমা কড়া নাড়িল। একজন বর্ষীয়সী রমণী দ্বার খুলিয়া বলিল "কে গা ?"

"এখানে ললিত বাবু আছেন ?"

"হাঁ ! থাকেন, এখন নাই।"

রমার মুখ আঁধার হইল, তার কাছেত ট্যাক্‌সি ভাড়ার টাকা নাই। যে দ্বার খুলেছিল সে বলিল," তুমি কে মা ?"

"আমি ললিত বাবুর বোন্ !"

"হ্যাঁ ! রমা ! এসো মা এসো।" বৃদ্ধার যেন কত আনন্দ ! সে আরও বলিল, ললিত যে তোমাদের আন্‌তে এই এখনই দেশে যাচ্ছে ? গৌরী কই ? ললিত বুঝি আস্‌তে চিঠি লিখেছে ? ব্যস্ত ছেলে, আবার নিজে ছুটেছে।"

সে রমণীর কথাগুলি অকপট স্নেহসূচক। ইনি কি আমাদের এত ভালবাসেন ? রমা বড় আশ্বস্ত হইয়া অপরার মুখের পানে চাহিল। গাড়োয়ান বলিল, "ভাড়াটা দিয়ে দাওগো।"

"কত ভাড়া বাবা?" বর্ষীয়সীর ঐ গাড়োয়ানের উপরও কত স্নেহ ভাব।

"যাও মা, ভিতরে যাও, আমি গাড়ীর ভাড়া দিচ্ছি।" বলিয়া সে রমাকে উপরে লইয়া, টাকা আনিয়া গাড়োয়ানকে দিয়া বিদায় করিল তারপর রমাকে হাত পা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া বসিতে বলিল। "না হয় একবারে নেয়ে টেয়ে নাও। গঙ্গা স্নান কর্‌বে নাকি?" এ রমণী যেন রমাকে কি দিয়ে আদর কর্‌বে, তা খুঁজিয়া পাইতেছে না। কে ইনি? রমা সংক্ষেপে হাত পা ধুইয়া বসিল। তার প্রাণে অনেক চিন্তা! ললিত বাড়ীতে গিয়াছে শুনিয়া সে গৌরী বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইল। বড় ভাবনা কাটিয়া গেলে, ছোট ভাবনা গুলি ফুটিয়া বাহির হয়। রমার এখন ভাবনা তার নিজের জন্য নয়, দুলালের জন্য।

সে রমণী তখন রমার পাশে বসিয়া তার আপন জীবন কথা বলিতে লাগিল। কেমন করিয়া সারা জীবন পাপের রাস্তায় দোকান পাতিয়া সে টাকা রোজগার করিয়াছে, কত লোকের সর্ব্বস্ব নিয়া সে টাকা করিয়াছে, তারপর ললিতকে সে কেমন করিয়া অপমান করিয়াছিল, ললিত যেমন করিয়া তাকে মা বলিয়া, তার সর্ব্বস্ব লইয়াছে। সে বলিল ললিত তাকে উদ্ধার করিয়াছে। ললিতের মা-ডাকে এমন মন্ত্র শক্তি আছে যে, তার সব পাপ কেটে গেছে। মা হ'তে পারলে আর নারীর পাপ কি? নারী হৃদয়ের যেখানটায় মা হওয়ার বীজ লুকান আছে, তাই যদি একবার ফুটিয়া উঠে, তবে নারীর কোনও পাপ, কোন জ্বালা থাকে না। গণিকা হোক, পতিতা হোক, নারী যদি একবার সন্তানের খাটি মা ডাক শুনিতে পায়, তবে খাটি মা হইয়াই পড়ে।

সে রমাকে কত কথাই বলিল, রমা তাহাকে বিশেষ কিছুই বলিল না। রমা ভাবিতেছিল, কি অভিশপ্ত জীবন নিয়ে পৃথিবীতে এসে

ছিলাম ! বুঝি অসীম রূপের মায়া আমার দেহে আছে ! নইলে এত লোক আমায় ভালবাসতে চায় কেন ? প্রথমে ভাল বেসেছিল ফটিক, তার ভালবাসা সফল হইল না। তার পর ভাল বেসেছিলেন, স্বামী ! কত আদরে, কত আশায় তিনি আমায় আপন করে আকুঁড়ে ধরেছিলেন। কিন্তু দুইটি বছর মাত্র আমায় পেয়েছিলেন। তারপর সরল বুদ্ধি দুলাল-চাঁদ। দুলাল সত্যই আমায় ভালবাসে। সে যেমন ভালবাসে, তেমন ভালবাসা আর কারু আমার উপর হয় নাই। আমার মিথ্যা প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে, সরল প্রেমিক, এক পলকও চিন্তা না করে, গৌরীর মত সুন্দরী মেয়ে বিবাহ করিতে গিয়া ছাদনা তল হ'তে ছুটে এসেছে ! তার বিনিময়ে কি নিষ্ঠুর প্রতিদান সে পেয়েছে ! আচ্ছা আমি কি এর কাউকে ভালবাসি নাই ? নিশ্চয়ই, সকলকেই ভালবেসেছি। ফটিককে ভালবাসি, স্বামীকে ভালবাস্তাম, দুলালকেও ভালবাসি ;— এখন থেকে। তবে আমি তিন পুরুষকে ভালবাসি, শাস্ত্রমতে আমি ব্যভিচারিণী ! আজ যদি বিধবা বিবাহ হিন্দু সমাজে প্রচলিত থাকিত, তবে আমি কাকে বিবাহ করিতাম ? ফটিককে ! না দুলালকে ! ফটিকের বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, অর্থ সম্পদ সকলই আছে, সুতরাং অসত্য কপটতা আছে অনেক। দুলালের বিদ্যা বুদ্ধি নাই, কিন্তু সরল প্রেমে তার হৃদয় উন্মত্ত ! সে সবটুকু দিয়ে প্রেম করিতে পারে, আর এরা প্রেম করে, ধন মান যশের দিকে কিছু অবশিষ্ট রেখে। প্রেমের পিপাসা শান্তি করিতে দুলালের প্রেমই অমৃত। সত্যই দুলালের প্রাণ আমার বৈধব্য-দুঃখ দেখে অকপটে কেঁদেছে ! দুলালের আছে শুধু হৃদয়, হৃদয়ের উপর যে আর একটা আবরণ বুদ্ধি, তাহার তাহা নাই। তাহার হৃদয় সরল শিশুর মতন নগ্ন ! ভগবান, দুলালকে রক্ষা কর।

এইত ভগবানের ন্যায় বিচার। রমা যে মনে মনে তিন পুরুষের

অনুরাগিণী, তাহাই তিনি অন্তর্য্যামী, তিনিই জানেন। লোকে জানে, রমা পবিত্র, চির ব্রহ্মচারিণী! লোককে,—সমাজকে ফাঁকি দেওয়া চলে, সর্ব্বতো চক্ষু ভগবান্‌কে ফাঁকি দেওয়া চলিবে কেন! তাইত তিনি আমায় কৌশলে কুলটা করিয়ে ঘরের বাহির করিয়া দিলেন। আর যাব না কুলে ফিরে, এই আমার সংসার থেকে চির বিদায়! রমার বড় ইচ্ছা করিতেছিল, কথাগুলি সে তার ধর্ম্ম মাকে শুনায়! কিন্তু পারিল না।

(২৩)

দুলালচাঁদ ষ্টেশনের অলি গলি ঘুরিল। রমার সন্ধান পাইল না। স্ত্রীলোক দেখিলেই তার কাছে যায়, যার মুখ ঘোমটায় ঢাকা দেখে তার দিকেই উঁকি মারে, কোথাও তাড়া খাইয়া সরিয়া আসে। তাহার কান্না আসিল। এখন সে কোথায় যাইবে? একটী পয়সাও তাহার হাতে নাই।

দুলাল জানে মানুষ হারাইয়া গেলে পুলিশে খবর দিতে হয়। কিন্তু তাহাতেও বিপদ আছে। সে বুদ্ধিতে যতটা স্থূল হউক না কেন, সেও যে রমাকে চুরি করিয়া আনিয়াছে, তাহা সে বুঝিতেছে, পুলিশে খবর দিলে সে যদি নিজে ধরা পড়ে! তবে কি রমা তাহাকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়াছে! এত নিষ্ঠুর কি রমা হইতে পারে! রমা যে তাহাকে ভালবাসে। সেও রমাকে বড় ভালবাসে। যার দারুণ বৈধব্য দুঃখ ঘুচাইতে সে এত করিয়াছে, মাতা ভগিনী, এত বড় বড়মানুষ ভগিনীপতির স্নেহ ছাড়িয়া, বিবাহের টোপোর ছুড়িয়া ফেলিয়া সে চলিয়া আসিয়াছে, সে এমন নিষ্ঠুর হইয়া তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল। তবে কি দুনিয়ায় যথার্থ প্রেমের স্থান নাই? যে রমাকে সে বুকের রক্ত দিয়াও সুখী করিতে চায়, সে এই করিল! সে এখন গঙ্গায় ডুবিবে, না বিষ খাইবে? দুলাল একবার কিছুদিন, যখন মানদা কলিকাতায় ছিল, তখন কলিকাতায় নন্দকিশোরের বাড়ীতে বাস করিয়া গিয়াছে। সেই সময় একজন ব্রাহ্ম বাবুর সঙ্গে তার

পরিচয় হইযাছিল। তার নাম ছিল, করালি বাবু। করালি বাবুর কাছেই সে হিন্দু ধর্ম্মের কুসংস্কারের কথা বুঝিয়া নিয়াছে। বিধবা বিবাহ যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাও সে তাহার কাছেই বুঝিয়া নিয়াছে। তার কাছে সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সে বিধবা বিবাহ করিবেই, নচেৎ বিবাহই করিবে না, এবং বিধবা বিবাহ করিতে পারিলেই সে কলিকাতায় আসিয়া, করালি বাবুর সাহায্যে ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্তই হইয়া বাস করিবে। ব্রাহ্ম সমাজে অনেক বড় লোক আছেন, তাঁহারা তাকে অবশ্য একটী চাকরী করিয়া দিবেন, অথবা সমাজের দাতব্য ভাণ্ডার হইতে তাহাকে ভরণ পোষণ দেওয়া হইবে, এমন ভরসাও সে পাইয়াছিল।

দুলাল ভাবিল নন্দ বাবুর বাড়ী সে অবশ্য চিনিয়া লইতে পারিবে, করালি বাবুব বাড়ী তারই বাড়ীর পাশে। একটা বেড়াইবার মাঠের কাছে তাহাদের বাড়ী। সে বাড়ীর দেওয়ালে বড় অক্ষরে লেখা আছে :— " লিপটনের চা, মিনার্ভা থিয়েটারে, পান্নালাল টনিক।" দুলাল যখন লেখা পড়া জানে, তখন অবশ্য বাড়ী খুজিয়া পাইবে। দুলালের বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল। বিবাহ হইবে বলিয়া আগের দিন তার মা তাকে কিছুই খাইতে দেন নাই। আজ এই বেলা ৯টা বাজে, খাবার কষ্ট সে কখনও পায় নাই। তাহার দুঃখও হইল, রাগও হইল কিন্তু রাগ করিবে কাহার উপর?

দুলাল খুঁজিতে খুঁজিতে একটা পার্কের সাক্ষাৎ পাইল। তাহারই পাশে দুটো বাড়ীতে লেখা আছে, সেই কথা গুলির কতকটা। নিশ্চয়ই এই বাড়ীতেই হইবে জানিয়া সে ডাকিল, "কলালি বাবু, কলালি বাবু; একবাল আসুন, আমি দুলাল বাবু।"

একটা লোক বলিল, "কি চান মশাই?"

"এখানে কলালি বাবু আছে না?"

ভাব বুঝিয়া সে লোকটী বলিল, "না গো, এখানে না, যাও।"

"কলালি বাবু কোথায় থাকে জানেন?"

"কোথাকার করালি বাবু?"

"যে বাবু বেম্ম সমাজে যায়।"

"কোন্ বেম্ম সমাজে রে বাবু?"

"যেখানে মেয়েমানুষে গান গায়।"

এই কটা কথায়ই লোকটা দুলালের কদর বুঝিল। গালাগালি করিয়া তাড়াইয়া দিল। দুলালের পা আর চলে না। সেইখানে মাটীতে বসিয়া পড়িল। দুলালের পরণে সেই বিবাহের কাপড় জামা, তা ধুলা কাদায় মাখা হইয়া বিশ্রী হইয়া যাইতেছে। দুলালের সেই খানে শুইয়া পড়িতে ইচ্ছা হইতেছে। রাত্রিতে তার ঘুমও হয় নাই। প্রত্যেক ষ্টেশনেই সে নামিয়া দেখিয়াছে, রমা কেমন আছে। তাইত শেষাশেষি তার একটু নিদ্রা আসিয়াছিল, সেই ফাঁকে রমা পলাইয়াছে।

একটু বাদেই ফটিক আসিয়া উপস্থিত। "কি দুলাল? প্রাণের পাখী বুঝি উড়ে গেছে?" বলিয়া ফটিক দুলালের হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল।

ফটিককে দেখিয়া দুলালের রাগ শেষ মাত্রায় উঠিল। নিশ্চয়ই এ ফটিকের কারসাজি। ফটিক বোধ হয় অপর গাড়ীতে এসে রমাকে পালিয়ে নিয়া গিয়াছে।

একে ক্ষুধা তৃষ্ণায় দুলালের হাড় দাহ হইয়া যাইতেছে, তার'পর আবার ফটিকের এমন উপহাস। দুলালের রাগ হইলে মরণ বাঁচন জ্ঞান থাকে না, দুলাল উঠিয়াই ফটিকের মুখে এক চাপড় কসিল। ফটিক মার খাইয়াও দুলালকে তা ফিরাইয়া না দিয়া, তার হাত ধরিতে গেল। দুলাল তার সম্মুখের চুলের গোছা ধরিয়া, আরও দু'একটা কিল

চড় মারিল, ফটিক দৌড়াইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। দুলাল চীৎকার করিয়া যা মনে আসে তাই বলিয়া গালাগালি দিতে লগিল। তাতেও তার মনে তৃপ্তি হইল না। দুলালের পকেটে সর্ব্বদাই একখানা ছুরি থাকিত, দুলাল তাই খুলিয়া ফটিকের বুকে বিধাঁইয়া দিল।

দেখিয়া রাস্তার লোক ছুটিয়া আসিল। পুলিশ আসিয়া উভয়কেই ধরিল। ফটিকের বুক দিয়া বেগে রক্ত বাহির হইতেছিল। তখনই তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইল। আঘাত অল্প হইলেও, ফুস্ ফুসের কাছে লাগিয়াছে, চিকিৎসক বলিল জীবন সংশয়।

(২৪)

ললিত বাড়ীতে প্রবেশ করিবার আগেই রাস্তায় থাকিতে প্রতিবাসীর কাছে অনেক শুনিয়া আসিয়াছে! তবু বাড়ীতে প্রবেশ করিল। দেখিল, গৃহের দ্বার মুক্ত, তৈজস পত্রাদি যেখানে যেমন ছিল তেমনিই আছে, রমা বা গৌরী কোথাও নাই! একি প্রহেলিকা! যেন একটা ভীষণ মহামারি এ বাড়ীর উপর দিয়া চলিয়া গিযাছে। নন্দকিশোরের বাড়ীর দিকে চাহিল। তাহাও যেন এমনি নির্জ্জন, নীবব! সেখানেও কেউ সাড়া শব্দ করিতেছে না। মাতঙ্গীর কলহ কণ্ঠত এতক্ষণ নিবৃত্ত থাকে না! সেও আজ নীরব!

ললিত বসিয়া বসিয়া ভাবিল। রমা যে কি একটা কৌশল করিয়া গৌরীকে উদ্ধার করিয়া লইয়া পলাইয়াছে, তাহা ছাড়া সে আর কোনও রূপ বিশ্বাস করিতে পারিল না। রমার বুদ্ধি শক্তি, সাহসের উপর তার যে বিশ্বাস ছিল, তা আরও বাড়িয়া গেল। রমা নিশ্চয়ই গৌরীকে নিয়া কোথায় লুকাইয়া আছে। দাদা বাড়ী আসিয়াছে জানিতে পারিলে, এখনই আসিয়া উপস্থিত হইবে।

ললিত আপন ঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া বসিয়া শ্রান্ত হইল। তারপর

ভাবিল যাই দেখি একবার হতভাগ্য নন্দকিশোরের গৃহে! দেখি সে উন্মত্ত বৃদ্ধ কি বলে, কি করে?

ললিত ধীরে ধীরে নন্দকিশোরের গৃহে উঠিল। বাহির থেকে শুনিল, নন্দকিশোর ক্ষীণ ভগ্নকণ্ঠে বলিতেছে, "মানদা! একি কল্লি? আরত মানুষের কাছে মুখ দেখান আমার সম্ভব নয়! পূর্ব্ব পুরুষের নাম ডুবলো, কুলে কলঙ্ক হলো! চারিদিক থেকে লোকে কি বল্‌ছে, শুন্‌ছ ত? কি শত্রুতা আমি তোমাদের করেছি যে, এমন করে আমার মুখ হাসালে? আমিত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, কেমন করে এমন হলো? এমন কুকর্ম্মে কেন আমার মতি হ'লো? গৌরী ছিল আমার বড় আদরের, তাকে এমন করে দুলালের সঙ্গে বিয়ে দিতে যেতে আমার প্রবৃত্তি হ'লে কেন? শেষকালে সে কোথায় গেল? তোমরা যেন আমায় কি করে তুলেছ?"

মানদা'ও যেন উন্মত্ত কণ্ঠে উত্তর করিল "চুপ করে থাক বৃদ্ধ, বেশী কথা বলো না। বুড়ো বয়সে বিয়ে কল্লে এমনই হয়?"

"হ্যা! বুড়ো বয়সে তোমায় বিয়ে করেছি বলে কি তোমায় কোনও বিষয়ে অসুখী করেছি? আমি সর্ব্বস্ব তোমায় ঢেলে দিয়েছি।"

"হ্যা! তুমি তোমার সর্ব্বস্ব দিয়ে, আমার সর্ব্বস্ব নিতে চেয়েছিলে। তাকি কখনও হয়? পঞ্চাশ বছরের শুষ্ক জীবনের সর্ব্বস্ব কি সতের বছরের তাজা যুবতীর সর্ব্বস্বে বিনিময় চলে? হতভাগ্য বৃদ্ধ! তুমি দিয়েছ সর্ব্বস্ব, কিন্তু পাও নাই এক কপর্দ্দকও। শোন, কথা যখন বুক থেকে বেরিয়ে গেছে, তখন স্পষ্ট বলে ফেলি। আমি চেষ্টা করেছি অনেক, দু'তিন বছর ধরে অনেক চেষ্টা করেছি, তোমাকে কিছু দেব বলে। তোমার ঘরে লক্ষ্মী বউটীর মত থাক্‌তে, তোমাদের শাস্ত্রের দোহাই মেনে, পতিকে দেবতা ভেবে পূজা কর্ত্তে, আমি চেষ্টা করেছি

অনেক ! কিন্তু তোমাদের শাস্ত্রের পক্ষপাতিতা, তোমাদের নিষ্ঠুরতাই আমার কাছে ফুটে উঠেছে, যতই আমি শাস্ত্রের কথা মনে তুল্‌তে গিয়েছি। পঁচিশ বছরের যুবক ললিত বলিল, আমি বিবাহ করিব না, তাই শাস্ত্র তাকে অবিবাহিত থাক্‌তে দিলে ! তাতে তোমাদের ধর্ম্ম গেল না, সমাজ গেল না। আর চৌদ্দ বছরের আগে, আমায় তোমার গলে গেঁথে না দিলে, সমাজের বুকে বজ্রাঘাত হ'লো ! কি অবিচার ! ভাল হবার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছি ! ভাল হ'তে পারি নাই কেন, জান ? তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের ঐ মদনমোহন সুন্দর মূর্ত্তি আমায় ভাল থাক্‌তে দেয় নাই।—যার নাম নিয়ে তুমি গিয়েছিলে আমায় যাচাই কর্ত্তে ! আমি তাকে আবার সুমুখ থেকে তাড়িয়েছিলাম. যদি নয়নের অন্তরাল হলে আমি ভাল হ'তে পারি ! কিন্তু তা হ'লো না, তখন বুকের রক্তের সঙ্গে সে মূর্ত্তি মিশে গেছে ! তাতে ললিত হ'লো, পবিত্র, অধর্ম্ম পাপ কখনও করে না ললিত। যদি ফটিক হতো, তা হ'লে এমন হতো না। দূর হোক্‌, তোমায় যে অনেক কথা বলে ফেলিছি ! তা হোক্‌, তুমি এখন বুঝ্‌তে পেরেছ, আমার খাটি প্রাণটা।' অর্থাৎ তুমি আর সইতে পার না আমার এই উৎকট প্রেম, আর বইতে পার না তোমার পাপের ভার, যা'হোক, তোমার পরে আমার দয়া হয়। তোমার ক্ষয় রোগ জন্মেছে আজ ছ'মাস, তুমি সাহস করে তা বল্‌তে পার নাই, পাছে আমি ব্যথা পাই, পাছে আমি বুঝ্‌তে পারি, তুমি ক্ষয়-রোগ-গ্রস্ত, মরণের পথিক ! এখন যেতে বসেছ ; কথাগুলি শুনে যাও, ধাঁধা কেটে গেলে পরকালে সুখ পাবে।"

ললিত আর শুনিল না, সেখানে আর দাঁড়াইল না। আস্তে আস্তে নামিয়া আপনার ঘরে আসিল।

সমস্ত দিন ললিত নানা স্থানে রমা ও গৌরীর অনুসন্ধান করিল।

সে দিন স্নানাহারের কথা আর তার মনে আসিল না। দিন গেল, রাত্রি আসিল। কোনও অনুসন্ধানই মিলিল না। রাত্রিতে ললিতের মনে হইল, নিমাইএর কথা! নিমাই! নিমাইকেত একবার দেখি নাই। এতক্ষণ নিমাইএর কথা তার মনেই আসে নাই। ললিতের আপনার উপর ধিক্কার জ্ঞান হইল! কি স্বার্থপর আমি; রমা গৌরীকে আপন ভেবে, তাদেরই ভাবনায় ডুবে আছি, নিমাইএর ভাবনা একবারও ভাবি নাই! সেওত আমার আপন! কিন্তু এত রাত্রিতে ওবাড়ীর দিকে পা বাড়াইতে তার আর সাহস হইল না।

রাত্রি গভীর হইল, জমির সরদার আসিয়া ডাকিল, "ছোট বাবু?" ললিত সাড়া দিল। পরক্ষণেই গৌরী আসিয়া অন্ধকারেই তার কোলে ঝাপিয়া পড়িল। "কাকাবাবু কাকাবাবু, আমার পিসিমা?" গৌরী কাকার বুক জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিল।

ললিত আলো জ্বালে নাই। আলো জ্বালিবার কিছু তার হাতে নাই। অন্ধকারেই জমিরকে বসিতে বলিল। "জমির! গৌরীকে কোথায় পেলে? রমা কোথায়?"

জমির সকল কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া ললিত কতকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল। তার পর বলিল, "ফটিক গৌরীকে তোমার কাছে রেখে গেছে! ফটিক আমার এমন বন্ধু!"

কিন্তু রমা কোথায়? দুলালই বা কোথায়। ফটিকও আজ সকালে কলিকাতায় গিয়েছে শুনিলাম! বিষয়টা ললিতের কাছে কিছু ঘোয়াল হইয়া আসিল। রমার উপর ফটিকের আবাল্য লালসার ভাব ললিতের জানা ছিল! ক্ষুর ধার বুদ্ধি ফটিকের।—কি জানি ঘটে।

রাত্রিতেই ললিত স্থির করিয়াছে, প্রত্যুষেই সে গৌরীকে লইয়া কলিকাতায় যাইবে। সেখানে নিশ্চয়ই রমার অনুসন্ধান পাইবে। রাত্রিতে সে একটুও ঘুমাইল না। শুধু ফেন ভাত রাঁধিয়া গৌরীকে খাওয়াইয়াছে, নিজে কিছুই খায় নাই। খাইতে তায় ইচ্ছা হইল না। সে কেবল ভাবিতেছে, এতগুলি অভাবনীয় ঘটনার মধ্যে তার জীবনটা ভগবান কেন নিয়ন্ত্রিত করিলেন।

প্রত্যুষের আগেই ও বাড়ীতে মানদায় আর্ত্তনাদ শুনিয়া ললিত চম্‌কে উঠিল! ললিত ছুটিয়া গেল। মানদা বিকট আর্ত্তনাদে বলিতেছে, " ও সর্ব্বনাশী! কি কল্লি? ও রাক্ষসি কি কল্লি? নিমাই! নিমাই! আমার নিমাই! রাক্ষসি, ডাইনি, এমন কাজটা তুই কল্লি কেমন করে?"

ললিত ত্রস্ত পদে সেগৃহে প্রবেশ করিল, দেখিল, নিমাইয়ের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, আর এক পার্শ্বে নন্দকিশোর সংজ্ঞাহারা। মানদা মাথা ভাঙ্গিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে!

সেই মুহূর্ত্তে ললিতের চৈতন্য লোপ হইল। "সর্ব্বনাশ! একি?"

মাতঙ্গী এক ধারে বসিয়াছিল। সে বলিল " রাত্রিতে দু'বার ভেদ গিয়াছিল, এখনত এই সর্ব্বনাশ। "

মানদা অর্ত্তেনাদে বলিল, " ওগো নাগো, তা নয়! ঐ রাক্ষসী ছেলেকে বিষ খাইয়ে মেরেছে। ঐ রাক্ষসী মেয়েকে রাজত্ব দিয়ে সুখী কর্ত্তে চায়। নন্দকিশোর মর্‌ছে, ও তার বংশ নাশ কর্‌তে চায়, তার টাকায় আপনার পেট বাঁচাতে! ওঃ! নিমাই আমার! যাদু আমার! আমি একটা দিন তোকে মায়ের প্রাণ দিয়ে আদর কর্ত্তে পারি নাই। কেবল ভেবে আস্‌ছি, বুড়োটা মরে গেলেই আমি তোর মা হবো

আমার জীবনের বড় সাধ, নারী জীবনের আর কোন সুখের আশা না মিটুক, মা হওয়া সাধ তোকে দিয়ে মিটাব! রাক্ষসি, সর্ব্বনাশী, এ কি কল্লি তুই?"

মাতঙ্গী বলিল, "কেন? তুই একদিন এমনি বলিছিলি না?"

"হ্যাঁ! বলেছিলাম, এক দিন আমার মনে এমনি পাপ জেগেছিল। কিন্তু তারপর, কত দোহাই দিয়া তোমায় বলেছি, না না, তা হবে না। এত বড় পাপ করো না। সেই থেকে ত নিমাইকে আমি মায়ের মত আদর কর্ত্তে লেগেছি! নিমাই! নিমাই! ওঃ"

মানদা মূর্চ্ছিত হইল। ললিত বুঝিতে পারিল না, একি ব্যাপার! স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল।

অল্পক্ষণ পরেই মানদা চৈতন্যলাভ করিয়া উঠিয়া বসিল। উঠিয়া বসিতেই স্তম্ভিতপ্রায় দণ্ডায়মান ললিতের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। কি ভীষণ বিষবর্ষিণী সে দৃষ্টি অশনিগর্ভ বিদ্যুচ্চমকের অপেক্ষাও সে দৃষ্টি তীব্র, বিশ্ববিদাহী প্রলয়ানলের অপেক্ষাও যেন সে নয়নজ্যোতিঃ প্রখর! মানদা বিকটকণ্ঠে বলিল, "কি দেখ্‌ছ ললিতমোহন?"

ললিতও অতিকঠোর কণ্ঠে বলিল, দেখ্‌ছি, যে নারীজাতি বুকের-রক্তে সন্তান পোষে, সে আবার রাক্ষসী হয়ে সন্তানের রক্তপান করে!"

আহত ফণিনীর ন্যায় রুষ্টশ্বাসে, শিকারভ্রষ্ট সিংহিনীর ন্যায় প্রখর-গর্জ্জনে মানদা বলিল, "সম্বর হে নরাধম পুরুষ, তোমার আত্মবঞ্চনায় এ অসত্য বাচালতা! মায়ের জাতি নারীকে কে রাক্ষসী করে দেয়? জান? তোমরা,—তোমরা পুরুষজাতি! নারী তার রক্তমাংস শক্তি দিয়ে, আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে, পুরুষকে গড়িয়ে দিয়েছে, পুরুষকে শক্তি-শালী করিয়ে দিয়েছে, তাই পুরুষ শক্তিশালী হয়ে, সংসারটা, সমাজটা তার আয়ত্ত কর্ত্তে পেরেছে! তাইত পুরুষের শাসনে নারী আবদ্ধ! তোমাদের

শাসননীতি,—তো মাদের শাস্ত্রবিধি,—নারী পুরুষের অধীন, নারী পুরুষের দাসী,—নারীজীবনের সবটুকুই পুরুষের সুখ সুবিধা ভোগবিলাসের জন্য, —আর পুরুষ চিরস্বাধীন! বার বৎসরের আগে নারীকে পুরুষের পায়ে জড়িয়ে না দিলে, নারীর ধর্ম্মরক্ষা হয় না, আর পুরুষ ইচ্ছাকর্লে সারাজীবন স্বাধীন স্বচ্ছন্দে কুমারজীবন নিয়ে কতইনা যশ মান খ্যাতি অর্জ্জন করে চলে যায়! ষাট বৎসরের বৃদ্ধ নন্দকিশোরের ঘরে বন্দিনী না হ'লে বার বৎসরের মানদার ইজ্জত গেল, আর বত্রিশ বৎসরের যুবক ললিতমোহন চিরকুমার সেজে সমাজে কতইনা বাহাবা নিয়ে যাচ্ছে! ললিত পরহিতে প্রাণ দেয়, দশের উপকারে শ্রম করে,—স্কুল করে, ডাক্তারখানা বসায়, নারী মানদা যদি স্বাধীন থাক্‌তো, তা কি সে পার্ত্ত না! এই দেখ, এই চব্বিশ বৎসর বয়স আমার,—কত ভোগের মধ্যে ডুবেছিলাম, দেখ্‌ছ কত প্রলোভন? ফটিকের রূপ যৌবন, ললিতমোহনের নিস্ফল অনুরাগ, এমন শতজনের লোলুপদৃষ্টি কেউ কি আমার নারীত্ব স্পর্শ কর্ত্তে পেরেছে? সংযমে নারী পুরুষ অপেক্ষা হীন,—কোন্ লজ্জায় পুরুষ একথা বল্‌তে পারে? তুমিকি বল্‌তে চাও ললিত, নন্দকিশোরের বংশ নাশের হেতু আমি? —নারী? নন্দকিশোরেয় বংশ নাশ করেছে' সে নিজে,—তার ভ্রাতুস্পুত্র ললিতমোহন। সেই ষাট বৎসরের জীর্ণ দেহে তুমিই তাকে তার নারী-ভোগলালসায় প্রশ্রয় দিয়েছিলে, তোমাদের যে আদর্শ পুরুষ ভীষ্ম, সেই সন্তান হয়ে তার পিতাকে এই ঘৃণিত লালসায় প্রশ্রয় দিয়ে ভীষ্মনাম কিনেছিল। তাইত ভারতের শ্রেষ্ঠ বীরকুল কুরুবংশের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। তাই জন্ম নিয়েছিল দুই অধম কামজ সন্তান, জারজ অপেক্ষাও তাহারা হীন! তাই সে বংশে জারজ বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি! কত বল্‌বো তোমায়? বল্‌বার অনেক কথা ছিল, কিন্তু সময় নাই,—শক্তি নাই। দারুণ পুত্রশোকে আমি জ্বলে যাচ্ছি,—আমার নারীত্ব আমার মাতৃত্ব

আমি ত্যাগ করি নাই,—ত্যাগ কর্ত্তে পারি নাই। আমার মাতৃত্ব ভোগের সার সম্পদ নিমাইএর দেহ ঐ ধূলায় গড়াচ্ছে, কি বুঝ্বে অধম পুরুষ তুমি আমার প্রাণের ব্যথা! আর আমার সংসারে কোনও কাজ নাই, কোনও আশা নাই! অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি তোমাকে, তোমার পুরুষ সমাজকে,—তোমাদের এই শবস্বরূপ পুরুষ সমাজের উপর নারী মহাশক্তি উল্লাসে নৃত্য করুক, তার পেষণে পুরুষ প্রাধান্য চূর্ণ হয়ে যা'ক.।"

মানদা আর দাঁড়াইল না, উল্কার মত ছুটিয়া পলাইল। সে পলায়নের বেগে মহাঝটিকাবেগে উন্মূলিত বৃক্ষের ন্যায় ললিত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া-গেল!

সেখানে সজ্ঞানে রহিল একাকিনী মাতঙ্গী, সে সংজ্ঞাহারা ললিতকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল "দেখ ললিত, আর বাড়াবাড়ি সোরগোল করে কাজ নেই। তোমারইত সুযোগ হলো, এখনত এ জমি জিরেট বাড়ী ঘরে তোমারই অধিকার হলো; কিন্তু আমার মানদা দুলালকে একবারে পায়ে ঠেলিও না। তুমি যদি মানদাকে বিয়ে কর্ত্তে, তা হলে কি এমন হয়? নিমাই ভেদ বমি হয়ে মরেছে, আর কিছু নয়. মানদা মিথ্যা কথা বল্‌ছে।"

তখন প্রভাত হইয়াছে। সে বাড়ীর চীৎকার শুনিয়া পাড়ার আরও দু চার জন লোক সেখানে আসিয়াছে। তাদের পিছনে আসিল, উন্নত ভাবে সনাতন, তার পিছনে ভোলানাথ।

সনাতন আসিয়াই নিমাইয়ের শব কোলে তুলিয়া লইল। মর্ম্মবিদারী শোকে বলিল, "এ কি দেখাতে নিয়ে এলে সন্ন্যাসী আমায়?"

সন্ন্যাসীর চক্ষেও জল এসেছে। তিনি অশ্রুভার কণ্ঠেই বলিলেন, "যা দেখ্‌তে তুমি চেয়েছিলে?"

"একটু আগে আমায় আনলে না কেন?"

"কিসের জন্য ?"

"আমি থাক্‌লে কি নিমাই মর্‌তে পারে ?"

"নিমাইএর মা যখন মরেছিল, তখন তুমি ছিলে না ?"

"সে মরেছিল রোগে, অপঘাতে নয়।"

"যার রোগ, তারই বিষ। এখন এ মরা রেখে চল।"

ভোলানাথ নিজেই সনাতনের বুক হইতে নিমাইএর সবদেহ সরাইয়া রাখিলেন। তার পর সনাতনের হাত ধরিয়া বাহিরে মুক্ত আকাশের তলে গিয়া বলিলেন "সনাতন, চেয়ে দেখ ঐ উদীয়মান সূর্য্যের পানে।

সনাতন সূর্য্যপানে চাহিল।

"কি দেখিতেছ ?"

"বুঝ্‌তে পারিনা।"

ভোলানাথ সনাতনের মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, "এখন দেখত ?"

"মা !"

"কেমন মা !"

"অপূর্ব্ব হাস্যময়ী, লীলাময়ী।"

"মা কি কচ্ছেন ?

"একটা পুতুল গড়্‌ছেন, আবার ভাঙ্‌ছেন।"

"ভাল করে দেখ, "

"হ্যাঁ! একটা নিমাই গড়্‌ছেন, আবার ভেঙ্গে আবার গড়্‌ছেন।"

"আচ্ছা! এখন দেখত ?"

"ওঃ! বড় ভয়ঙ্করী! অসংখ্য শবের উপর দাঁড়িয়ে, অসংখ্য মানুষ আছড়িয়ে মাচ্ছেন! বিকট দৃষ্টি! বিকট মুখ! এ দেখতে পারি না!" সনাতন চক্ষু মুদিল।

"তবে আবার দেখ।"

"হ্যাঁ! এইত মা।"

"মা কি কচ্ছেন?"

"কিছুই না, কেবল মৃদু মৃদু হাস্‌ছেন!"

"আচ্ছা, এসো।" বলিয়া ভোলানাথ সনাতনের হাত ধরিলেন। সনাতন বিচেতন হইয়া পড়িয়া গেল।

---

(২৬)

প্রতিবাসীরা আসিয়া নিমায়ের শব বাহিরে নামাইল! নন্দকিশোরের যখন চৈতন্য হইতেছে, তখন আর্ত্তনাদ করিতেছেন, আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাইতেছেন। গ্রামবাসীরা বলিতেছে, পুলিশে না জানাইয়া এ শব দাহ করিলে বিপদ হইবে। ললিতকে জিজ্ঞাসিলে সে কোনও উত্তরই দিতেছে না। গড়িমিশি করিয়া বেলা অনেক হইয়া উঠিল।

মানদা এখন আর সে যায়গায় নাই। সে আর অর্ত্তনাদও করিতেছে না সকলেই বুঝিল পাপীয়সী মানদারই এই ' কাজ। ব্যভিচারিণী নারী না করিতে পারে কি? এখন ঢং করিতেছে! .

কতক্ষণ পরেই মানদা, অনাবৃত দেহে অনাবৃত মস্তকে ভীষণ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে আসিয়া নিমাইয়ের মৃতদেহের পাশে লুটাইয়া পড়িল। তার মুখ দিয়া প্রবল বেগে রক্ত বমন ছুটিল! পশ্চাতে আসিয়া মাতঙ্গী বিকট চীৎকারে বলিল। ওগো তোমরা একটা ডাক্তার ডাক। মানদা আমার বিষ খেয়েচে।"

যারা সেখানে ছিল, তারা এতবড় চমকপ্রদ ব্যাপার কখনও চিন্তা করিতেও পারে নাই। দেখিতে দেখিতে মানদার সুন্দর লাবণ্য কালী হইয়া গেল, তার প্রাণ-হীন দেহ নিমাইয়ের দেহের পদমূলে পড়িয়া রহিল।

সকলেই বুঝিল, বিধাতার অপূর্ব্ব লীলা।

সে দিন অপরাহ্ণে রমাও তাহার ধর্ম্ম মাকে সঙ্গে নিয়া বাড়ী আসিল। তখন মানদা ও নিমাইয়ের শব সরকারী ডাক্তার খানায় পরীক্ষার জন্য লইয়া গিয়াছে। মাতঙ্গীকে আসামী করিয়া আটক করিয়াছে।

সনাতনকে লইয়া ভোলানাথ তার আগেই প্রস্থান করিয়াছেন।

লোকালয় হইতে অনেক দূরে, বিন্ধ্যাচলের একটি সঙ্কীর্ণ নির্জ্জন গুহায় ভোলানাথ সনাতনকে লইয়া আশ্রম স্থান নির্ণয় করিয়াছেন। গুহার উর্দ্ধ ভাগে দুই পার্শে দুইটী মহুল বৃক্ষ অবনত হইয়া পড়িয়া গুহাটীকে বিলক্ষণ ছায়া শীতল করিয়া রাখিয়াছে, আর একটী পার্ব্বত্য অশ্বত্থ গুহার সন্মুখ ভাগে একটু দূরে, কত কালের প্রাচীন সে,—তাহার অগণ্য বিলম্বিত শিকড় রাশিতে সেই কঠোর প্রস্তর-বক্ষ ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! কত বিহঙ্গম তাহাতে আশ্রয় লইয়াছে। সে স্থানে কদাচিৎ পথিক চলে, সুতরাং তলদেশ শাখাভ্রষ্ট শুষ্ক পত্ররাজিতে ছাইয়া রহিয়াছে, কিন্তু সে নিবিড় ছায়ায় লতাগুল্মাদি জন্মে নাহি; পার্শ্বেই একটা ক্ষুদ্র ঝরণা বর্ষাকালে পর্ব্বতবাহী প্রচুর জলরাশি বহিয়া বহু দূরের ঐ ভাগীরথীর যে শাখা পশ্চিম উত্তর বাহিনী হইয়া পবিত্র বারানসী ধাম বেষ্টন করিয়া আবার পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রবাহে সাগরে চলিতেছে, তাহাতে তাহার ক্ষুদ্র শক্তি যুক্ত করিয়া ধন্য হইতেছে! ভোলানাথ বলিলেন, "সনাতন, বলত, এ সংসার কার সৃষ্টি?"

সনাতন নিঃসন্দেহ নির্ভয়ে বলিল "মায়ের।"

"কই সে মা?"

"ঐ দূরে ঐ গঙ্গা।"

"ঐ গঙ্গাই সৃষ্টির আদিভূতা?"

"তা বই কি? কত পাহাড় পর্ব্বত ভেঙ্গে, নীচে নেমে যাচ্ছেন মা, কেবল গড়্ছেন, আর ভাংছেন, মায়ের এ ভাঙ্গা গড়ার বিরাম কই দাদা?"

"উর্দ্ধে আকাশের দিকে দেখ্ছ?"

"দেখ্ছি বই কি? ঐত সারি বাঁধা মেঘ-মালা, মা আবার ফিরে আস্ছেন, আবার গ'লে জল হ'য়ে করুণারূপে ধরায় নাম্বেন।"

"শুধু মায়েরই সৃষ্টি, বাবা তবে কেউ নাই?"

"আছেন বই কি? ঐ পর্ব্বতরাজের শিখরে বাবা মহাদেব, তাঁরইত মহাজটায় মহামায়ের আশ্রয়! কিন্তু বাবা ভোলানাথ, সদাই বিভোর, কাজ কর্ম্ম নাই, কিছুই করেন না। মায়েরই কাজ, মায়েরই ছুটাছুটি।"

ভোলানাথ পরমানন্দে হাসিলেন।

দুইজন পথবাহী সেদিকে আসিতেছিল, সে পথে লোকজন কমই চলে, তবু এ দুইজন সে দিকেই আসিতেছিল। নিকটে আসিলেই দেখা গেল তাহারা স্ত্রীলোক, সন্ন্যাসিনীর বেশ একজন যুবতী আর একজন প্রৌঢ়া। ভোলানাথ বলিলেন "দেখ সনাতন, কারা আস্ছে?"

সনাতন নিরুদ্বেগেই বলিল, "ও ত, রমা, আর সেই তাঁর ধর্ম্ম মা। চল আমরা গুহার মধ্যে যাই।"

"কেন?"

"ওরা আমাদের দেখ্লে হয়ত অনেক বিরক্ত কর্বে, না দেখে চ'লে যাক।"

"না, আসুক, শুনি ওরা কেন আস্‌ছে। ওদের সঙ্গে কথা বল্‌তে তোমার ইচ্ছা হ'চ্ছে না ?"

"কি প্রয়োজন ? আবার কি ঝঞ্ঝাট না হয় বেধে যাবে।"

ভোলানাথ আবার হাসিলেন, বলিলেন "ভয় নাই ভাই, তোমার আরব্ধের সমাপ্তি হয়েছে, আর জড়াবে না।"

তাহারা নিকটে আসিল। ভোলানাথ ডাকিলেন, "রমা !"

রমা ভোলানাথের পায়ে লুটাইয়া পড়িল। তাহারা বড় পথশ্রান্ত। সনাতন তাহাদের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। গুহায় জল ছিল, পান করিতে দিলেন, ফল ছিল, খাইতে দিলেন। একটু সুস্থ হইলে দুইজনেই তাহাদিগকে লইয়া ঝরণার স্নান করাইয়া আনিলেন। পরে সুস্থ স্বচ্ছন্দ হইলে ভোলানাথ বলিলেন, "রমা, দারুণ দানব-সমরে ক্ষত বিক্ষত হয়েছ বোন্।"

রমা অতি কাতরা, যেন কথা বলিতে পারিল না, তাহার ধর্ম্ম মা বলিলেন, "ঠাকুর, মেয়েটাকে ত কিছুতেই শান্ত কর্ত্তে পার্চ্ছি না ! কাশী বৃন্দাবন গঙ্গা ত্রিবেদী কোথাও গিয়ে রমা তার ব্যথা জুড়াতেত পাচ্ছে না !"

ভোলানাথ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি জুড়াতে পেরেছ ত মা ?"

প্রৌঢ়া বলিলেন, "আমি ছিলাম মহা পাতকী, আমার চেয়ে পাপীত কেউ ছিল না বাবা, কিন্তু যে দিন আমি আমার পাপের ধন দিয়া ঠাকুরের পূজা কর্ত্তে পেরে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে পেরেছি, সেই দিন আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে গিয়েছে। আমার কোনও কষ্ট, কোনও জ্বালা নাই। কিন্তু রমা, দেবতার মত পবিত্র সতী রমা, কিছুতেই যে সান্ত্বনা পাচ্ছে না।"

ভোলানাথ বলিলেন, "তুমি ভোগে তৃপ্ত হ'য়ে আসক্তি শূন্য হয়েছ,

তোমার সহজে মুক্তি হয়েছে, তুমি ভাগ্যবতী। রমা বাসনার সঙ্গে সমর করেছে বড় কঠোর, ভোগ করে আরব্ধের অবসান কর্ত্তে যায় নাই, বীর্য্য-বলে আরব্ধ ক্ষয় কচ্ছে, কষ্টত কিছু হ'বেই। তবে আর চিন্তা নাই, রমা এখন শান্তি পাবে। শোন রমা, ফটিক এতকাল পরে তোমার বাসনা, সংসারের সকল বাসনা ত্যাগ করে, পরিব্রাজক ভাবে ঘুর্‌ছে, এ ভাবে দুই চারি জন্ম গেলে তারা উদ্ধার হ'তে পারে। দুলালের তোমার প্রতি আর বাসনা নাই, যে ক্ষণিক প্রেমের ঔন্মেষ হয়েছিল, কায়ক্লেশ ভোগ করে তা দমে গিয়েছে। সে নিরীহ, এখন শান্ত সুস্থ ভাবে দিন যাপন কচ্ছে। ললিতের কর্ম্মবন্ধনের অবসান ইহজন্মে হ'বার নয়। এ জন্ম তাকে কর্ম্ম করে যেতেই হবে, কর্ম্মে তার আনন্দ লাভ হবে। ভগবান তাকে দিয়ে আরও কয়েক জন্ম কর্ম্ম করাবেন। তার কর্ম্ম পিপাসা প্রবল। আজ থাক, কাল আমি তোমাকে দীক্ষা দান কর্‌বো। তার পর মা মেয়ে গিয়ে কাশীতেই বাস কর্‌বে।"

সনাতন কিন্তু রমার কাছে কোনও খবরই জিজ্ঞাসা করিল না, তাহার বড় যত্নের তুলসী কুঞ্জ ও শেফালী গাছটীর কথাও জিজ্ঞাসা করিল না; নিমাইয়ের নামও করিল না! কেবল একবার বলিয়াছিল, "হতভাগ্য নন্দকিশোর।"

পরিশিষ্ট।

নন্দকিশোর অল্প দিন মধ্যেই দেহ রক্ষা করিলেন। ললিতকে তার ধর্ম্ম মা ও রমা অনেক অনুরোধ করিল, বিবাহ করিয়া গৃহ ধর্ম্ম করিতে। ললিতের বিস্তর সম্পদ। তার ধর্ম্মমার দেওয়া ত্রিশ হাজার টাকা; নন্দকিশোরের নগদ কিছু ছিল না, বিশ হাজায় টাকার জমিদারিতে তারই অধিকার। এ ছাড়া সনাতনের সেই সামান্য টাকা কয়টাও রমা তাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই। এ সব লইয়া ললিত গৃহী হইলে চির দিন সুখে কাটাইতে পারিবে, তা সকলেই বুঝাইল। ললিত কোনও কথাই শুনিল না।

একটী সৎ পাত্র খুজিয়া গৌরীর বিবাহ দিল। গৌরীর বিবাহে ললিত কোনও আমোদ উৎসব করিল না। বর পাত্র কোনও পণ বর সজ্জার দাবি করেন নাই। ললিত কেবল শাখা শাড়ি দিয়া গৌরীকে সমর্পণ করিল। দুলালকে বিয়ে দিতে গিয়া, নন্দকিশোর গৌরীকে কতক- গুলি অলঙ্কার দিয়াছিলেন, তা গৌরীর গায়েই ছিল। ললিত সে গুলিও খুলিয়া রাখিল।

মাতঙ্গী বিচারের আগেই হাজতে থাকিয়া মরিয়া গেল। ফটীককে আহত করিবার জন্য দুলালের এক বৎসর জেল হইয়াছিল। দুলাল আর দেশে ফিরে নাই। করালী বাবুর খোজ পাইয়া তাহার বাড়ীতেই পাচকের কাজ করিতেছে।

ফটিক দুলালের আঘাত হইতে বাঁচিল বটে, কিন্তু তাহার স্বাস্থ্য চির তরে ভগ্ন হইল। ভগ্ন দেহ মন লইয়া সে আবার একবার রমার সঙ্গে

সাক্ষাৎ করিয়াছিল। রমারও শরীর ভগ্ন, সে রূপ লাবণ্য শুষ্ক প্রায়। রমা বলিল," ফটিক! আর কেন? এ জীর্ণ জীবনে ভোগের বাসনা বৃথা। এখন শান্তিতে যাতে পর পারে যেতে পার, তারই উদ্যোগ কর ভাই।"

ফটিক তাহাই করিল। সেই হইতে ফটিকের সহিত আর কোনও পরিচিতের সাক্ষাৎ হইল না। তাহার বসতী বাড়ী, গৃহ সামগ্রী কিছু সঞ্চিত ধনও ছিল, ফটিক তাহার কোনও ব্যবস্থাই করিয়া গেল না। তাহা যে পাইল সেই আত্মসাৎ করিল।

নন্দকিশোরের বাড়ীতেই ললিতের সঙ্কল্পিত ডাক্তারখানার প্রতিষ্ঠা হইল। আর তার জমিদারীর আয় সেই ডাক্তার খানার খরচ চালাই-বার জন্য সরকারের হাতে গচ্ছিত করা হইল।

ললিত নিজের জন্য রাখিল, কেবল তার সেই বাগানটী' আর তার নিজের বাড়ীখানি।

ধর্ম্ম মাকে সঙ্গে দিয়া রমাকে কাশী পাঠাইয়া দিল।

সকলে বলিত, "ললিত, বিবাহ কর, এত এড় বংশটা লোপ পায়!"

ললিত বলিত, "বিষে ধরা বংশ কখনও রক্ষা পায়? পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, সমগ্র হিন্দুজাতিই মুমূর্ষু, অচিরে লোপ পাইবে। তবে এ মরা গাঙ্গে আর বিন্দু পেড়ে লাভ কি?"

ললিত যতক্ষণ পারে কাজে ব্যস্ত থাকে। সুস্থ হইলে বসিয়া ভাবে এতবড় "বিষের বাতাস" কোথা হইতে বহিল, যাতে এত বড় বনিয়াদি বংশটা একবারে নোনা ধরা করে রাখিল।

সম্পূর্ণ।